

strikes, Vol. 2).

সহজ কথায় বিপর্যয় বা disaster-এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- (a) বিপর্যয় আকস্মিক ও দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী।
- (b) বিপর্যয়ে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদহানি ও বিপুল সংখ্যার মানুষের জীবনহানি হয়। তবে সম্পদ ও জীবনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ সহজ নয়। বিভিন্ন সময়, পরিস্থিতি ও দেশভেদে এই পরিমাপের পার্থক্য হয়। 2001 সালের World Disaster Report-এ বলা হয়— কোনো দুর্ঘটনা তখনই বিপর্যয় বলে গণ্য হবে যখন—
  - (1) দশ বা তার বেশি মানুষের মৃত্যু হবে।
  - (2) একশো বা তার বেশি মানুষ আহত হবে।
  - (3) পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্যের দরকার হবে।
  - (4) সরকারিভাবে আপৎকালীন পরিস্থিতি ঘোষিত হবে।

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা (Natural Hazard Research Group) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে— কোনো দুর্ঘটনায় কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ হানি, অন্তত একশো মানুষের মৃত্যু এবং একশো মানুষ আহত হবে, তাকে বিপর্যয় বলা হবে (Basu, 2007)।

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Belgium বড় বিপর্যয়ের সংজ্ঞা দেন এইভাবে—

- (1) অন্তত 100 মানুষের মৃত্যু হবে,
- (2) দেশের জাতীয় GDP-এর এক শতাংশ বা তার বেশি পরিমাণে ক্ষতি হবে,
- (3) দেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ বা তার বেশি আক্রান্ত হবে (Smith & Petley, 2007)।

## দুর্যোগের সৃষ্টি

পরিবেশে দুর্যোগ সাধারণত তিনভাবে ঘটতে পারে—

- (1) কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সংঘটিত দুর্যোগ (Natural Hazards)।
  - (2) প্রাকৃতিক শক্তি এবং মানুষের কার্যকলাপ উভয়েই যার জন্য দায়ী এমন দুর্যোগ (Quasi Natural Hazard)।
  - (3) কেবলমাত্র মানুষের অপরিণামদর্শিতার ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ (Manmade Hazards)।
- ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি প্রভৃতি দুর্যোগ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক

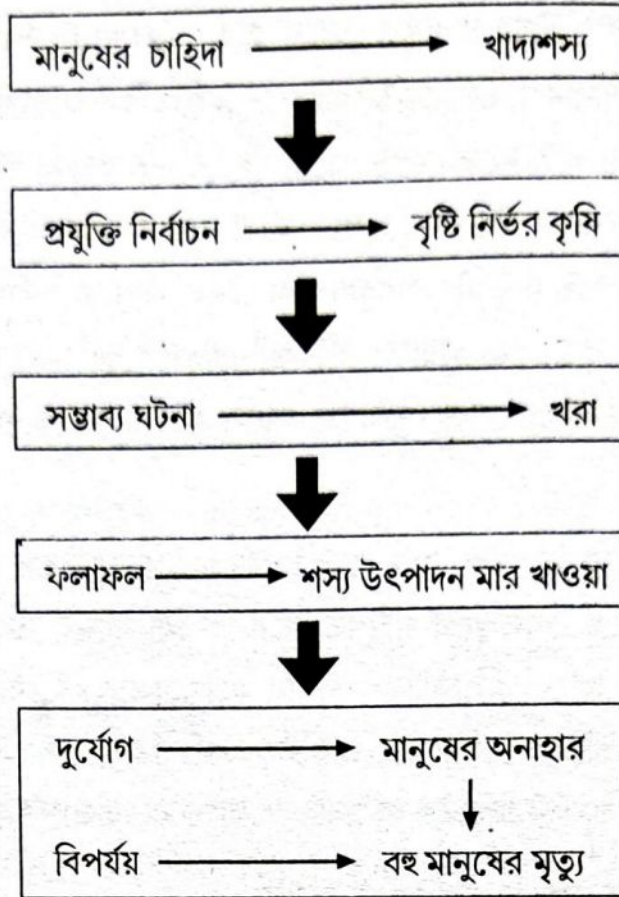
কারণেই সৃষ্টি হয়। এগুলির উপর মানুষের কোনো হাত নেই। মানুষ এদের কাছে অসহায়।

বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, দাবানল, ভূমিধস ইত্যাদি দুর্যোগ প্রাকৃতিক কারণেই হয়। কিন্তু মানুষের কার্যকলাপের ফলে নদীর খাত মজে যেতে পারে, বাঁধের জল ছাড়ায় গাফিলতি হতে পারে। এসব কারণে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক, আধা শুষ্ক অঞ্চলে এমনকি আর্দ্র অঞ্চলেও অবৈজ্ঞানিকভাবে জলসম্পদ ও ভূমির ব্যবহার খরা ডেকে আনতে পারে। দুর্ভিক্ষ, দাবানলের প্রসঙ্গে একই কথা বলা যায়। পার্বত্যচালে অবৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিকার্য বা নগরায়ণের ফলে ভূমির ধস প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। কাজেই এগুলি আধাপ্রাকৃতিক দুর্যোগ (Quasi Natural Hazard)।

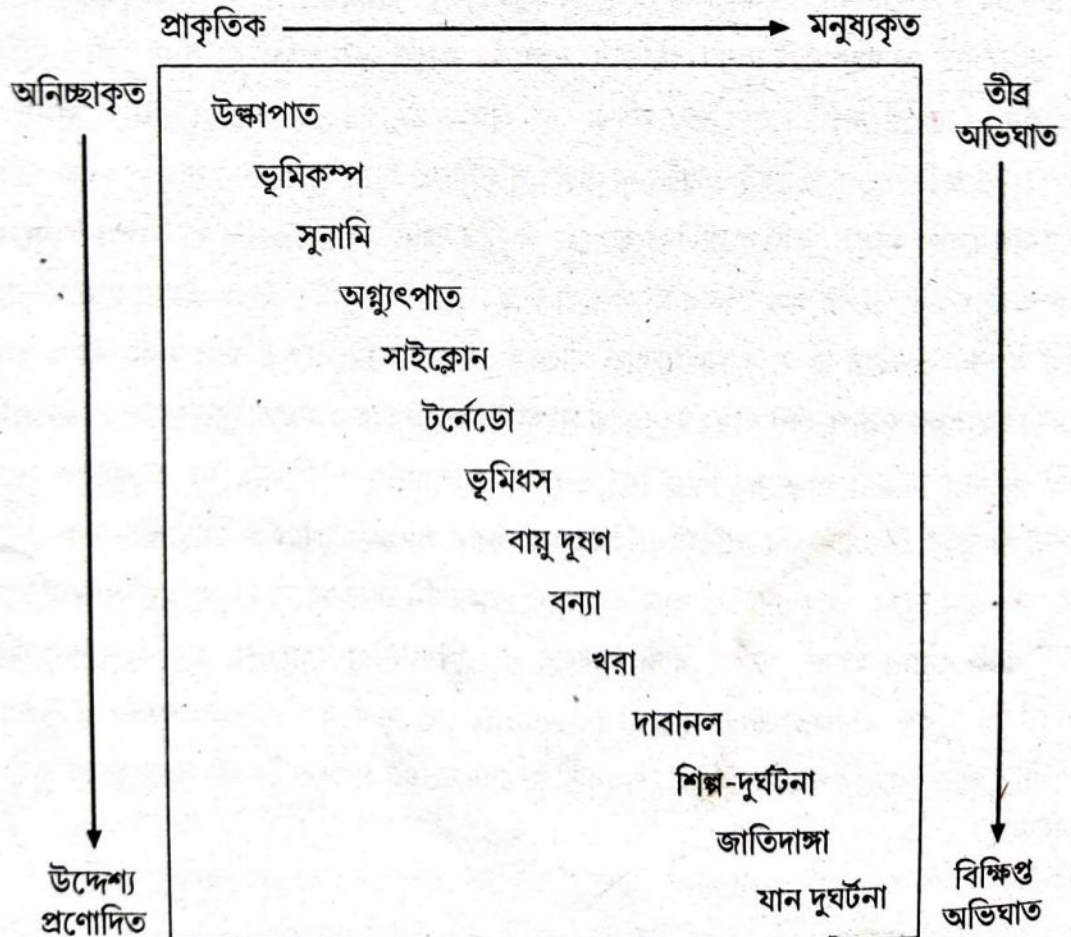
যদি কোনো অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রচুর সম্পদ ও জীবনহানি হয়, জঙ্গিগোষ্ঠী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোনো এলাকাকে ধ্বংসস্বূপে পরিণত করে, অথবা যুদ্ধের সময় বিরোধী এলাকায় বোমা, রকেট ইত্যাদির সাহায্যে এলাকাটিকে শাসন করে দেওয়া হয়, যদি বিবাক্ত রাসায়নিক বা মারণরোগের জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া হয়, প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবেশকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তবে সেখানে প্রকৃতির কোনো হাত থাকে না। এগুলিই হল মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ।

**মানবসভ্যতার উন্নয়নের সঙ্গে দুর্যোগ সৃষ্টির সম্পর্ক :**

গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, মানবসভ্যতার জয়যাত্রা, মানুষের আর্থিক উন্নতি, এসবই পৃথিবীতে দুর্যোগের ঘনঘটা বাড়িয়ে চলেছে। কারণ ভূমিকম্প বা বন্যা যদি জনহীন প্রান্তরে ঘটতো, তবে সেগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা বলে স্বীকৃত হতো। এই ধরনের ঘটনায় মানুষ বা তার সম্পদের ক্ষতি হলে, তবেই এগুলি দুর্যোগ। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, আরও বেশি বেশি মানুষ ক্ষতির ঝুঁকির কবলে পড়ছে আর Vulnerable বা বিপন্ন মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও বাড়ছে। কারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়লে জনপ্রতি সম্পদ ব্যবহার ও খরচের মাত্রাও বাড়ছে। ফলে পরিবেশের মান সর্বত্র ধরে রাখা যাচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়। মানুষের সংখ্যা ও তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার ফলে জনপ্রতি ও মোট খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু বিশ্বউষ্ণায়ন, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রসারের ফলে কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্বজুড়ে কমে যাচ্ছে। কাজেই অচিরেই এক দেশে খাদ্যের অকুলান হলে, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমদানি করা যাবে না, কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য থাকবে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সমগ্রবিশ্ব খাদ্যসংকট বা Food insecurity তে ভুগবে। কাজেই সভ্যতার উন্নয়ন এবং দুর্যোগ হাত ধরাধরি করে চলেছে। পরবর্তী চিত্রটিতে এই সম্পর্কটিকেই সহজভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।



### দুর্যোগের শ্রেণীবিভাগ :



আগের পাতার চিত্রটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, উল্কাপাত বা ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ সম্পূর্ণই প্রাকৃতিক, সেটা মানুষের অনিচ্ছাকৃত ও অভিঘাতও তীব্র। আবার ভূমিধস, বন্যা, খরা প্রভৃতি দুর্যোগে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যকৃত কারণ দুই-ই দায়ী। আবার ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতো শিল্প দুর্ঘটনা, জাতিদাঙ্গা বা যান দুর্ঘটনা ইত্যাদি দুর্যোগ একেবারেই মনুষ্যকৃত এবং কখনও কখনও দুই-ই মানুষের কু-উদ্দেশ্যেও এতে মিশে থাকে। এছাড়াও দুর্যোগের প্রভাব কার বা কিসের উপর পড়ছে তা বিচার করেও দুর্যোগের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন—

দুর্যোগের শ্রেণী	ফলাফল
1) মানুষের উপর আঘাতকারী	মৃত্যু, দৈহিক আঘাত, রোগের প্রাদুর্ভাব, মানসিক অশান্তি
2) জিনিসপত্রের উপর আঘাতকারী	সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি, আর্থিক ক্ষতি
3) পরিবেশের উপর আঘাতকারী	জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস, দূষণ, সুযোগ সুবিধা ও পরিষেবার ক্ষতি

কোনো দুর্যোগ যখন ব্যাপকহারে প্রাণহানি ও সম্পদহানি ঘটায়, তখন সেটা বিপর্যয়ে পরিণত হয়। কোনো দুর্যোগ বিপর্যয়ে পরিণত হবে কিনা, সেটা দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় মানুষের বিপন্নতার মাত্রার উপর নির্ভর করে। বিপন্নতার মাত্রা আবার কয়েকটি উপাদানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

### বিপন্নতার মাত্রা নির্ধারক কারণ সমূহ :

দুর্যোগের ফলে মানুষের বিপন্নতা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন—

- (1) **দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা (Resilience) :** এই ক্ষমতা যার যত বেশি থাকবে, তার বিপন্নতাও তত কমবে। অনুন্নত দেশগুলিতে প্রতিবছরই, বন্যা, খরা, মহামারী প্রভৃতির সঙ্গে থাকতে থাকতে, মানুষের একটা সহ্যশক্তি তৈরি হয়ে যায়। আবার উন্নত বিশ্বের দেশগুলি খুব দ্রুত ভেঙে পড়া পরিষেবা ব্যবস্থা চালু করে, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে প্রচুর অর্থ খরচ করে দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে।
- (2) **পরিকাঠামোয় নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) :** উন্নত বিশ্বের বাড়িঘর মজবুত। দুর্যোগের আগাম আভাস দেওয়ার পরিকাঠামোও অনেকাংশে নিখুঁত। যেমন— জাপানে প্রচুর ভূমিকম্প হলেও সেদেশে ঘরবাড়ি ও অন্যান্য পরিকাঠামো এমনভাবে তৈরি যে, খুব একটা প্রভাব পড়ে না। কিন্তু অনুন্নত বিশ্বে এই সুবিধা পাওয়া যায় না, তাই বিপন্নতাও বেশি হয়।
- (3) **অর্থনৈতিক কারণ (Economic factors) :** অনুন্নত বিশ্বের দরিদ্র মানুষের হাতে

দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার মতো পুঁজি, জমি, অন্যান্য সম্পদ, যন্ত্রপাতি কিছুই থাকে না। সাধারণ জীবনেই তারা খাদ্য বা চিকিৎসা সংকটে ভোগে। কাজেই বলা যায় পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার অভাব অনুন্নত বিশ্বের মানুষের বিপন্নতা, উন্নত বিশ্বের মানুষের তুলনায় অনেক বাড়িয়ে দেয়।

(৪) সামাজিক কারণ (Social factors) : বয়স ও লিঙ্গভেদে মানুষের বিপন্নতা বদলে যায়। সচরাচর শিশু বা নাবালক এবং বৃদ্ধদের বিপন্নতা সমর্থ মানুষের চেয়ে বেশি। আবার পুরুষদের তুলনায় নারীদের বিপন্নতা বেশি। কারণ শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের দৈহিক ক্ষমতা কম, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন কম। ফলে যেকোনো দুর্যোগে সমর্থ পুরুষদের তুলনায় এদের প্রাণহানি বা আঘাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

(৫) রাজনৈতিক কারণ (Political factors) : অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা বাড়িয়ে দেয়। দেশের অভ্যন্তরে জাতিদাঙ্গা, সীমান্তে বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, শরণার্থী মানুষের বিপন্নতা বাড়িয়ে তোলে।

(৬) সামগ্রিক পরিবেশের মানের অবনমন (Environmental degradation) : বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ, অরণ্য ছেদন, অতিরিক্ত কৃষি, বিশ্বউষ্ণায়ন, ওজোনস্তর ক্ষয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘনঘন খরা ও বন্যা ডেকে আনে। অস্বাভাবিক বর্ষা ভূমিধস, পাড় ভাঙন প্রভৃতি দুর্যোগকে বাড়িয়ে তোলে। এর ফলেও মানুষের বিপন্নতা বাড়ে।

আগের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে উন্নত বিশ্বের মানুষের থেকে অনুন্নত বিশ্বের মানুষের বিপন্নতা অনেক বেশি। এইসব দেশে জনসংখ্যাও বেশি, যেকোনো দুর্যোগে প্রচুর প্রাণহানি ও সম্পদহানির সম্ভাবনাও অনেক বেশি। তাই অনুন্নত বিশ্বে দুর্যোগগুলি প্রায়শই বিপর্যয়ে পরিণত হয়।

**দুর্যোগ মোকাবিলার উপায় বিষয়ে ধারণার ক্রমবিবর্তন :**

প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে মনে করতো এবং অসহায়ভাবে প্রকৃতির রোষের কাছে আত্মসমর্পণ করতো। পূজো আচ্ছা করে প্রকৃতিকে শান্ত করার চেষ্টা করতে হত। ধীরে ধীরে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দুর্যোগ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলাতে থাকে।

**প্রযুক্তির সাহায্যে সমাধানের খোঁজ (Search for engineering solution) :** প্রায় 4000 বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ প্রথম নদীতে বাঁধ দেওয়া শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষকে দুর্যোগ মোকাবিলার পথে অনেকখানি

এগিয়ে দেয়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার প্রযুক্তি আসার ফলে কোনো এলাকায় খরা ও বন্যা ঘটার আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রযুক্তিগত সমাধানকেই প্রাধান্য দেওয়া হত।

**আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধানের খোঁজ (Search for behavioural solution) :** বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মানুষের বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী কার্যকলাপও যে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উস্কে দেয়, সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হয়। অনেকক্ষেত্রেই মানুষের আচরণ বদল করে, সম্পদ ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রকরণ বদল করে দুর্যোগ মোকাবিলার চেষ্টা শুরু হয়।

**টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সমাধানের খোঁজ (Search for solution in sustainable development) :** 1970-এর দশক থেকে বৈজ্ঞানিকরা ভাবতে শুরু করেন যে, উন্নয়নের বৈষম্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ অনুন্নত দেশগুলিতে পুঁজি ও পরিকাঠামোর অভাব সহজেই দুর্যোগকে বিপর্যয়ে পরিণত করছে। কাজেই কোনো দেশে টেকসই উন্নয়ন দুর্যোগের সংঘটন ও ভয়াবহতাকে কমিয়ে দিতে পারে।

**সার্বিক সমাধানের খোঁজ (Search for a complex integrated solution) :** একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছেন যে, কোনো অনুন্নত এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে গেলে প্রযুক্তিগত সমাধানও যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বিষয়ে মানুষের আচরণেরও বদল দরকার। আবার সার্বিকভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে sustainable development বা টেকসই উন্নয়নও দরকার। তাই কোনো একভাবে সমাধানের চেষ্টা না করে সামগ্রিকভাবে সমাধান করাই শ্রেয়।

### দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করার উপায় :

দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রসংঘের প্রচেষ্টা :

- (1) কোনো দেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্রুত, কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে সাহায্য করা— এইসব কাজের জন্য রাষ্ট্রসংঘ Disaster management team গঠন করে।
- (2) 1971 সালে বিপর্যস্ত অঞ্চলে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৈরি হয় United Nation's Disaster Relief Co-ordinator। এদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার আবেদন করে 50 হাজার ডলার পর্যন্ত সাহায্য পেতে পারে।
- (3) বিশ্বস্ত অঞ্চলে উন্নয়ন ও বিপর্যয়ের প্রভাব নিবারণের জন্য অর্থ সাহায্য করে United Nations Development Programme.
- (4) কৃষি, পশু, পাখি ও মাছ উৎপাদকের পুনর্বাসনে পরামর্শ ও অর্থসাহায্য দেয় Food and Agriculture Organization (FAO)।

- (5) ত্রাণ, পুনর্গঠন, পুনর্বাসনে বার্ষিক প্রায় সাড়ে চার কোটি ডলার পর্যন্ত সাহায্য করতে পারে World Food Programme (WFP)।
- (6) বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে দুর্গত মানুষ যখন অন্য অঞ্চলে, অন্য দেশে আশ্রয় নেন, তখন সেই শরণার্থীদের সুরক্ষার জন্য সাহায্য করে United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)।
- (7) বিপর্যয়ের প্রাকৃতিক উৎস, ঝুঁকির অনুমান ইত্যাদি গবেষণার কাজে যুক্ত হয় United Nations Educational, Scientific and Culture Organization (UNESCO)।
- (8) বিপর্যস্ত বা দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে উপযুক্ত বাসস্থান তৈরির বিষয়ে পরিকল্পনা, পরামর্শ ও আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করে United Nations Centre for Human Settlement (UNCHS) Habitat।
- (9) দুর্যোগ প্রবণ ও বিপর্যস্ত দেশে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে নজর রাখে, বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থব্যয় করে— United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)।

### দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যান্য সংস্থা

- (1) জাপানের কোবে শহরে আছে Asian Disaster Reduction Centre। এই সংস্থাটি এশিয়ার দুর্যোগগ্রস্ত দেশগুলিকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য করে।
- (2) এ ছাড়াও এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবিলায় আরও দুটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা হল— Asian Disaster Preparedness Centre (রাষ্ট্রসংঘের ভারপ্রাপ্ত সংগঠন) এবং Asia-Pacific Disaster Management Centre (ফিলিপিনসের ম্যানিলায়-এর সদর দপ্তর)।

### আন্তর্জাতিক সম্মেলন

1992 সালে ব্রাজিলের রিও-ডি জেনিরোতে যে বসুন্ধরা সম্মেলন বসে সেখানে একুশ শতকের উপযোগী একটি অঙ্গীকার তালিকা গ্রহণ করা হয়। সেখানে একটি ধারায় বলা হয়েছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগগ্রস্ত দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক সাহায্য দান অবশ্য কর্তব্য হবে।

এ ছাড়াও রাষ্ট্রসংঘের এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে 1994 সালের 23 মে থেকে 27 মে জাপানের ইয়াকোহামা শহরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবমুক্ত অধিকতর নিরাপদ বিশ্ব তৈরির জন্য অঙ্গীকার করা হয়। এবং

সেই সঙ্গে দুর্যোগগ্রস্ত অঞ্চলে দুর্গত মানুষের উন্নয়নে গাফিলতি ও বিশৃঙ্খলার কড়া সমালোচনা করা হয়।

## বিপর্যয় মোকাবিলায় ভারত সরকারের ভূমিকা

ভারত এমনই একটি দেশ যেখানে, দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও মৃত্যু সাধারণ মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ব্যাপার। মহামারি থেকে খরা, বন্যা থেকে ঘূর্ণিঝড়, কিংবা ভূমিকম্প, ভূমিধস, এমনকি সুনামি কোনো দুর্যোগের হাত থেকেই এদেশের মুক্তি নেই। প্রতি বছর এইসব দুর্যোগের ফলে মৃত, আহত, রুগণ, পঙ্গু মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতিদাঙ্গা, জঙ্গি নাশকতা এবং মারণ রোগের প্রাদুর্ভাব।

নথিপত্র থেকে জানা যায়, 1988 থেকে 1997 এই দশ বছরে 24 মিলিয়ন লোক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছেন এবং প্রতি বছর গড়ে 5,116 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। 1998 সালে বিভিন্ন দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় 3,41,12,566 এবং মৃত্যু হয় 9846 জন মানুষের। 1985 থেকে 1995 এই সময়ে বছরে গড়ে এই কারণে আর্থিক ক্ষতি হয় 1,883.93 মিলিয়ন US ডলার।

2002 সালের জুন মাসের পর থেকে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ ভারত সরকার স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপর ন্যস্ত করেছে। তবে খরা মোকাবিলার ভার আছে কৃষিদপ্তরের উপর। 2004 সালে ভারত সরকার বিধ্বংসী সুনামি ঘটার পরে ভূমিকম্প ও সুনামির আগাম পূর্বাভাস ও নির্দেশ প্রচারের জন্য যন্ত্রপাতি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনো বিপদ ঘটে গেলে কেন্দ্র সরকারের কৃষি, সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কর্মসংস্থান, পরিবেশ ও বন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প, বিমান, রেল, পরমাণু গবেষণা, স্বরাষ্ট্র, মানবসম্পদ বিকাশ, জলসম্পদ, প্রতিরক্ষা, অর্থ, যোগাযোগ দপ্তর এবং পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে জরুরি সমন্বয়সাধন করা হয়। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকে তহবিল যেখান থেকে দ্রুত ত্রাণের জন্য খাদ্য, ওষুধপত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামের অর্থ যোগান দেওয়া হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি মনে রেখেও বলা যায়, ভারতে দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা দুর্ঘটনা ঘটার পরে উদ্যোগী হয় (Reactive), কিন্তু ঘটার আগে প্রতিবিধানে গাফিলতি দেখায় (Not proactive)।

আন্তর্জাতিক স্তরে কিন্তু এখন দুর্ঘটনা ঘটার পরে মোকাবিলার থেকেও ঘটনা ঘটার আগে আগাম পূর্বাভাস ও প্রস্তুতির উপর অনেক বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমানে ভারতেও এই ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যেমন—



- (১) মানুষ ও সম্পদের উন্নয়ন।
- (২) বিপর্যস্ত ও বিপর্যয়প্রবণ অঞ্চলের সঠিক তথ্যসংগ্রহ ও মজুত রাখা এবং এই কাজে মহাকাশ দপ্তর, দূর অনুধাবন (Remote sensing) ব্যবস্থা এবং Geographic Information System-এর সাহায্য নেওয়া।
- (৩) জাতীয় স্তরে National Committee for Disaster Management নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।
- (৪) জনশিক্ষা বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপর্যয় মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- (৫) এই সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন করা।
- (৬) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্যোগ এলে গ্রামস্তরে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতির আয়োজন সম্পূর্ণ করা।
- (৭) পেশাদারি প্রতিষ্ঠান যেমন সেনাবাহিনী, আবহাওয়া দপ্তর, পুলিশবাহিনী, পূর্তদপ্তর, দমকল বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, অসামরিক প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর। এগুলির মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান ও জরুরি সমন্বয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং প্রত্যেকের কাজ, দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া।
- (৮) সঠিক তথ্য, সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার পরিকাঠামো তৈরি। এটাতে ব্যর্থ হলে, আংশিক সত্য ও গুজবের চাপে দুর্যোগগ্রস্ত মানুষের দুর্গতি বহুগুণ বেড়ে যায়। যেসব দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস পাওয়া যায়, সেইসব ক্ষেত্রে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা তৈরি রাখা।
- (৯) সরকারি স্তরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে মহড়ার ব্যবস্থা করা।
- (১০) খরা, বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় প্রবণ অঞ্চলে ফসলের বিমার ব্যবস্থা করা।
- (১১) ভূপালের মতো রাসায়নিক বিপর্যয় যাতে না হয় সেজন্য শিল্প কারখানাগুলির দিকে কড়া নজর রাখা।

### প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেলে কী করা উচিত

- (১) অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, কর্তব্য, দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষকে সচেতন থাকতে হবে।
- (২) গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একসঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলার চেষ্টা করতে হবে।

- (3) বিপর্যয়ের ফলে মৃত্যু, অঙ্গহানি, পঙ্গুত্বের জন্য কর্মক্ষম মানুষ কমহীন হয়ে পড়ে। ফলে অতি দ্রুত পরিবারে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্তরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।
- (4) অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- (5) শরণার্থী শিবিরে শিশু ও নারীরা পাচার ও স্ত্রীলতাহানির কবলে পড়ে, তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- (6) বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যও বিপর্যস্ত হয়। চারিপাশে ধ্বংস ও শোকের আবহে মানসিক শূন্যতা ও অবসাদ সৃষ্টি হয়। এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সমাজকে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে।

### প্রশ্নাবলী

- 1। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাকে বলে? এর শ্রেণিবিভাগ করো।
- 2। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা কীভাবে করা যায়, বিশদে ব্যাখ্যা করো।
- 3। দুর্যোগ কাকে বলে? ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা এবং সৃষ্টির কারণ অনুযায়ী এর শ্রেণিবিভাগ করো। উপযুক্ত উদাহরণ দাও।
- 4। বিঘ্ন ও বিপর্যয়ের তুলনা করো। উন্নয়নশীল বিশ্বে বিপর্যয় বেশি ঘটার কারণ কী?
- 5। দুর্যোগের মোকাবিলা কীভাবে করা যায় তা বিশদে ব্যাখ্যা করো।

### তথ্য আকর :

1. প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা— তারক ব্যানার্জী। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন।
2. India disasters report towards a policy initiative—edited by Parasuraman S. and Unnikrishnan P.V., Oxford, 2001.
3. Some Aspects of Natural Disaster Management, Prof. Dilip Kumar Sinha, Institute for Rural Development, Natural Disaster and Environmental Management (IRUDEN DEM), 2002.
4. Hazard Perception and Disaster Management, edited by Dr. Mridula Niyogi, Dr. Sriparna Bose, Dr. Bansari Guha, Ms. Bhaswati Ray, Sivanath Sastri College, Department of Geography, 2007.
5. Society Development and Environment, Prof. Sunil Kumar Munsu, Felicitation Volume, edited by Ranjan Basu, Sukla Bhaduri, Progressive Publishers, 2006.
6. Coping with Natural Hazards : Indian context, edited by K. S. Valdiya, Orient Longman, 2004.
7. Smith, Keith and Petley, David N. (2009) : Environmental Hazards, Assessing risk and reducing disaster, Fifth edition, Routledge, London and New York.

(d) ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রাবল্যতা (Magnitude of earthquake wave)

(e) ভূকম্পীয় তরঙ্গের গড় ত্বরণ (Average acceleration of earthquake wave) প্রভৃতি।

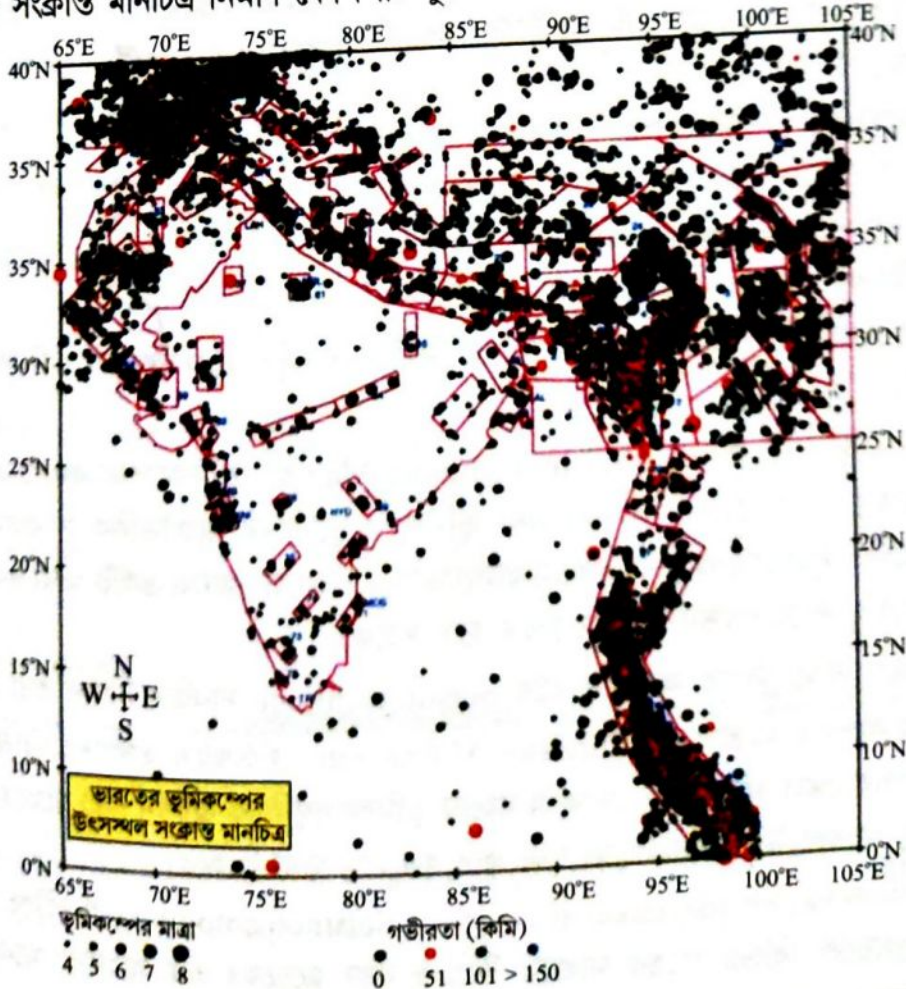
➤ **মানচিত্র নির্মাণ (Map Construction)** : ভূমিকম্পের মানচিত্র নির্মাণে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে, যা "Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP)" নামে পরিচিত। McGuire-এর "Peak Ground Accelerations (PGA)" পরিমাপক পদ্ধতিতে 'FRISK88M Software'-কে আদর্শভাবে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে প্রতিটি ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলির মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

1996 সালের পর থেকে হায়দ্রাবাদে অবস্থিত "National Geo Physical Research Institute (NGRI)" ভারতের ভূমিকম্পের বিভিন্ন উৎসস্থল এবং ভূমিকম্পের বিভিন্ন তীব্রতা অঞ্চলের মানচিত্রগুলিকে দায়িত্বসহকারে প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট 'NOAA Catalogue'-এ ভারতের  $0^{\circ}$ - $40^{\circ}$  N এবং  $65^{\circ}$ - $100^{\circ}$  E পরিসরে ভূমিকম্পের মানচিত্রগুলি নির্মাণ করা হয়। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পের মানচিত্র নির্মাণের কৌশল উপস্থাপন করা হল।

**1. Seismicity and Source Zonation Map** : ভূকম্পীয় উৎস সংক্রান্ত আঞ্চলিক মানচিত্রটি মূলত কোনো অঞ্চলের ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রকৃত গতিবিধি অনুধাবন করেই নির্মাণ করা হয়।

▪ **কৌশল (Techniques)** : এই ধরনের মানচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যে কৌশলগুলি অবলম্বন করতে হয়, তা হল—

- (i) **অনুশীলনক্ষেত্র (Study Area)** : মানচিত্র নির্মাণের জন্য প্রথমেই অতীতে একাধিকবার ভূমিকম্প ঘটেছে এরকম একটি স্থানকে অনুশীলনক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করা হয়।
- (ii) **পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Observation Centre)** : এরপর, ভূমিকম্পের বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থির করা হয়। এখানে ভূমিকম্পের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে চ্যুতি অঞ্চল বা বিভিন্ন পাতসীমানা (Plate boundary)-কে অবলম্বন করে স্থির করা হয়।
- (iii) **তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)** : এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্প এবং তার উৎসস্থলের গভীরতা সংক্রান্ত তথ্যগুলিকে দীর্ঘকাল ধরে নিবন্ধিকরণ করা হয়। এখানে যে সমস্ত তথ্যগুলি বিশেষ প্রাধান্য পায়, সেগুলি হল—
- ভূমিকম্পের উৎসস্থলের অবস্থান তথা ভূমিকম্পের কেন্দ্র।
  - ভূমিকম্পের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তরঙ্গের পরিধি।
  - ভূমিকম্পে প্রভাবিত সামগ্রিক অঞ্চল।
  - সক্রিয় চ্যুতি অঞ্চল।
  - ভূগাঠনিক পাতের গতিবিধি।
  - সমভূকম্পন অঞ্চল প্রভৃতি।
- (iv) **সংকলন (Compilation)** : ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করে এরপর মানচিত্র সংকলন করা হয়। প্রসঙ্গত, ভারতের ভূতাত্ত্বিক গঠনকে প্রাধান্য দিয়ে 1984 খ্রিস্টাব্দে Khattri যে 'Seismicity and Source Zonation Map' নির্মাণ করেছিলেন, তার ভিত্তিতে এখানে ভূমিকম্প সংক্রান্ত মানচিত্র নির্মাণ কৌশলটি তুলে ধরা হল।



চিত্র 5.2 : ভূমিকম্পের উৎসস্থল সংক্রান্ত মানচিত্র (Khattri প্রদত্ত)

- (a) ভূমিকম্পের উৎসস্থল সংক্রান্ত মানচিত্র নির্মাণের জন্য ভারতের যে অঞ্চলটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার বিস্তার হল  $0^\circ$  থেকে  $40^\circ$  উত্তর অক্ষরেখা এবং  $65^\circ$  পূর্ব থেকে  $105^\circ$  পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা।
- (b) এরপর নির্ধারিত একটি বিশেষ ক্যাটালগে ভারতের চ্যুতিরেখা অঞ্চলগুলিকে অধ্যারোপ (Superimposed) করা হয়েছে।
- (c) সংশ্লিষ্ট চ্যুতিরেখা অঞ্চল বরাবর অতীতে বিভিন্ন সময়ে ঘটা ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভূমিকম্পের উৎসস্থল অনুসারে এখানে 1-86 টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- (d) এরপর ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রীয় স্থলগুলিকে ভূমিকম্পের মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কালো রঙের ছোটো, মাঝারি কিংবা বড়ো অসংখ্য বিন্দু আকারে সংশ্লিষ্ট ক্যাটালগে প্রতিস্থাপিত করা হয়।
- (e) সমগ্র মানচিত্রটিতে বিভিন্ন রঙের বিন্দু দ্বারা ভূমিকম্পের গভীরতা কতটা তা উপস্থাপন করা হয়েছে।
- (f) এছাড়াও, ভূমিকম্পের উৎস সংক্রান্ত মানচিত্রটিতে ভারতের বিভিন্ন ভূমিকম্পপ্রবণ শহরগুলিকে উপস্থাপন করার জন্য ইংরাজির বর্ণমালার একাধিক অক্ষরকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

উপাদান	বিভিন্ন প্রকৃতি	নির্দেশক
ভূমিকম্পের মাত্রা	অতি মৃদু	•
	মৃদু	•
	শক্তিশালী	•
	অতি শক্তিশালী	•
	অত্যন্ত শক্তিশালী	•
ভূমিকম্পের গভীরতা	অতি স্বল্প গভীর	কালো বর্ণ
	স্বল্প গভীর	লাল বর্ণ
	মধ্যম গভীর	সবুজ বর্ণ
	অতি গভীর	নীল বর্ণ
ভূমিকম্পপ্রবণ শহরের নাম	BUJ	ভূজ
	CAL	কোলকাতা
	HYD	হায়দ্রাবাদ
	JBL	জব্বলপুর
	SRI	শ্রীনগর
	NDL	নতুন দিল্লি
	LAH	লাটুর
	MDS	মাদ্রাজ
PBL	পোর্টব্লেয়ার	

প্রসঙ্গত, ভূমিকম্পের উৎসস্থল সংক্রান্ত মানচিত্র নির্মাণে ব্যবহৃত নির্দেশকগুলি উলিখিত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

**2. Seismotectonic Map :** Seismotectonic Map হল ভূমিকম্পের এমনই এক বিশেষ ধরনের মানচিত্র, যেখানে ভূতত্ত্ব, ভূ-প্রাকৃতিক সংস্থান এবং ভূমিকম্প দুর্যোগের মাত্রাভিত্তিক সংকলনগুলি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তা ছাড়া এই মানচিত্রে আধুনিক পাতসঞ্চালন তত্ত্বের সাহায্যে কোনও একটি অঞ্চলের গাঠনিক পরিসরে ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলি বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

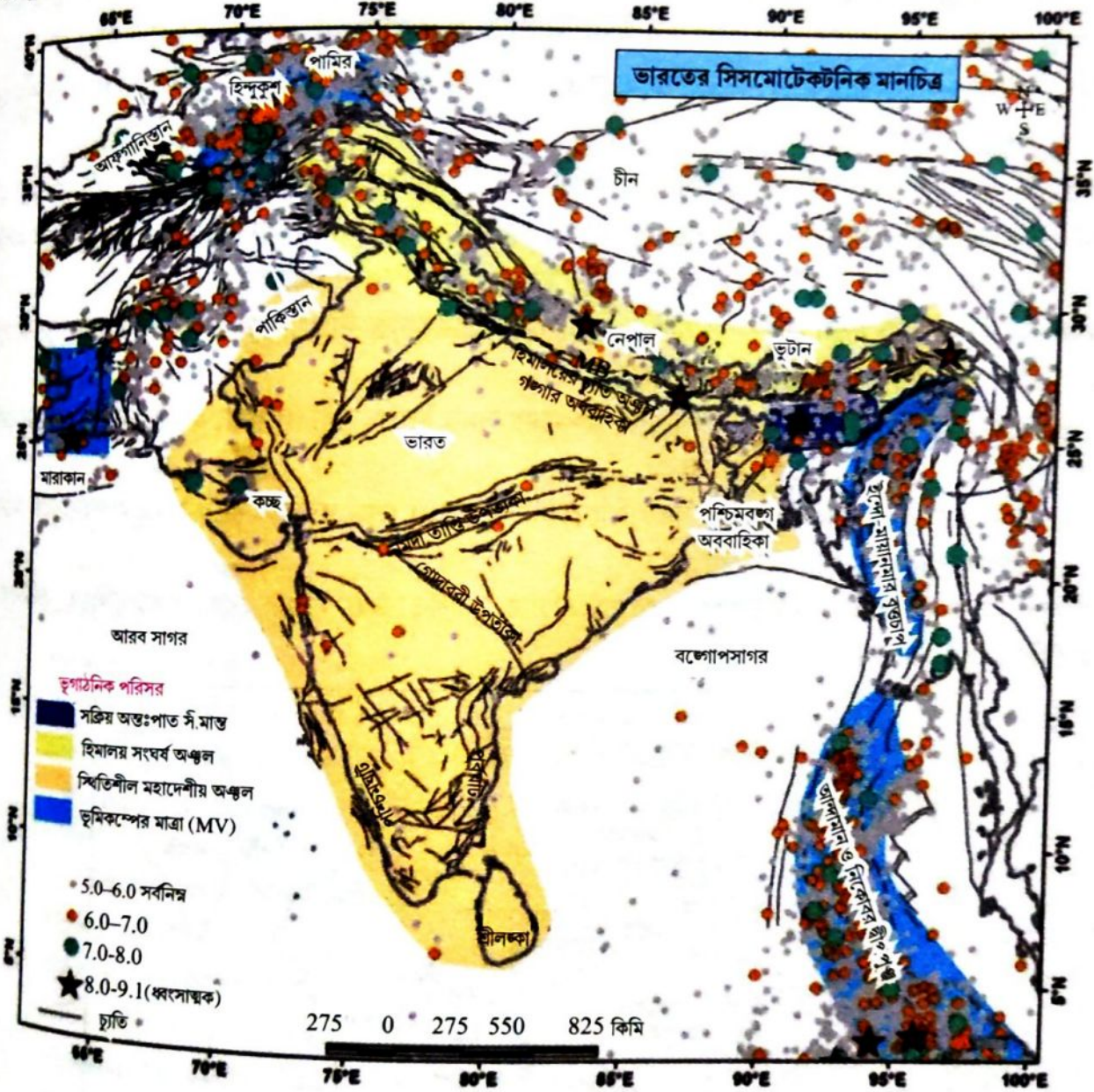
প্রসঙ্গত, যে সমস্ত বিষয়গুলিকে অধ্যয়ন করে Seismotectonic মানচিত্র নির্মাণ করা হয়, তা হল—

- (a) **ভূমিকম্পের মাত্রা (Earthquake Magnitude) :** এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত রিখটার স্কেল অনুযায়ী 5 থেকে 8 মাত্রার ভূমিকম্পগুলিকে প্রদর্শন করা হয়েছে। মানচিত্রে প্রতিটি ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত (○) দ্বারা চিহ্নিত।
- (b) **গাঠনিক পরিসর (Structural range) :** Seismotectonic মানচিত্রটিতে ভূগাঠনিক প্রতিটি পরিসরকে বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর সাহায্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের গাঠনিক ঝুঁকিগুলিকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়।

(c) **ভূতাত্ত্বিক গঠন (Geological Structure)** : সংশ্লিষ্ট মানচিত্রে যে সমস্ত ভূতাত্ত্বিক গঠনগুলিকে প্রদর্শন করা হয়েছে, সেগুলি হল—(a) চ্যুতি (Fault), (b) উপপৃষ্ঠীয় চ্যুতি (Sub Surface Fault), (c) স্বাভাবিক চ্যুতি (Normal Fault), (d) নব্যভূগাঠনিক চ্যুতি (Neotectonic Fault), (e) বিখণ্ডিত অঞ্চল (Shear Zone), (f) থ্রাস্ট ও সন্নিহিত অঞ্চল (Thrust and Suture Zone), (g) সক্রিয় অন্তঃপাত সীমান্ত (Active subduction boundary) প্রভৃতি।

এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মানচিত্রটিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক শহর এবং রাজ্যভিত্তিক সীমানা বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

\* **কৌশল (Techniques)** : Seismotectonic Map নির্মাণ কৌশলটি অনেকটা BMTPC প্রদত্ত Earthquake Hazard Map নির্মাণের কৌশলের মতো।



চিত্র 5.3 : ভূমিকম্পের Seismotectonic মানচিত্র

প্রথমত, ভারতের নির্দিষ্ট সীমানাভিত্তিক অঞ্চলকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যার সামগ্রিক বিস্তৃতি 5° উত্তর থেকে 40° উত্তর অক্ষাংশ এবং 65° ডিগ্রি পূর্ব থেকে 100° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত, এরপর ভূগাঠনিক দিক থেকে চ্যুতি অঞ্চল, সক্রিয় অন্তঃপাত সীমান্ত, সংঘর্ষ অঞ্চল, স্থিতিশীল অঞ্চলগুলিকে ভূমিকম্পের ভিত্তিতে নিপুণভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, এরপর সংশ্লিষ্ট অঞ্চল জুড়ে ঘটা অতীতের বিভিন্ন সময়ের অনুভবযোগ্য ভূমিকম্পের বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী তার উৎসস্থলগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে মানচিত্রটিতে ★ চিহ্ন দ্বারা সর্বোচ্চ মাত্রা বিশিষ্ট ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলি প্রদর্শিত হয়েছে।

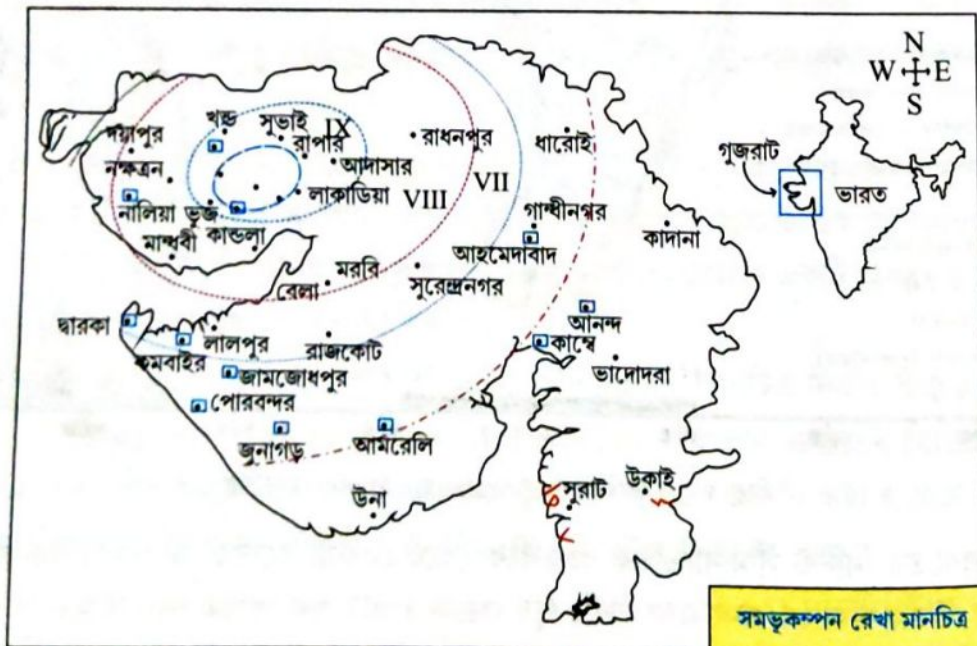
**3. Isoseismal Line Map :** ভূপৃষ্ঠের কোনও অঞ্চলে সমান ভূকম্প তীব্রতার স্থানগুলিকে কোনো কাল্পনিক রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হলে, তাকে সমতীর ভূকম্পন রেখা বলা হয়। আর, যে বিশেষ মানচিত্রে এই সমতীর ভূকম্পীয় স্থানগুলিকে উপস্থাপন করা হয়, তাকেই **Isoseismal Line Map** বলা হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, হাঙ্গেরিতে 1810 খ্রিস্টাব্দে ভূবিজ্ঞানী Mor কর্তৃক পৃথিবীতে প্রথম Isoseismal Line Map তৈরি করার প্রচেষ্টা শুরু হলেও, তা সফলভাবে প্রকাশিত হয় 1857 খ্রিস্টাব্দে Robert Mallet-এর প্রচেষ্টায়।

■ **কৌশল (Techniques) :** সাধারণত কোনো স্থানে ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার ঠিক পরেই ভূমিকম্পের Isoseismal Line Map তৈরি করা হয়। এর জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করতে হয়। **যেমন—**

- কোনো স্থানে ভূমিকম্প ঘটার পর সেখান থেকে ভূমিকম্পের মাত্রাগত বন্টন সম্পর্কে বিশদ তথ্য আহরণ করতে হয়।
- বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্যগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সারণিতে সাজিয়ে তার যথার্থতা বিচার করা হয়।
- এরপর Mercalli কিংবা Richter Scale-এ পাওয়া ভূমিকম্পের সমান তীব্রতার মাত্রাগুলিকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানচিত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিন্দুর মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হয়।
- এরপর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পদ্ধতির দ্বারা সমান তীব্রতায়ুক্ত বিন্দুগুলিকে ঘিরে কয়েকটি পৃথক পৃথক প্রায় বৃত্তচাপীয় রেখা অঙ্কন করা হয়।
- প্রতিটি ভূকম্পীয় সমতীরতা রেখাগুলি অঙ্কনের সময় বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়, যাতে কোনো রেখাই যেন একে অপরকে ছেদ না করে।
- সবশেষে পৃথক পৃথক মাত্রার রেখাগুলিতে নির্দিষ্ট রঙের শেড ব্যবহার করে সমভূকম্পনরেখা মানচিত্র উপস্থাপন করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট সমভূকম্পন রেখামানচিত্রে প্রদর্শিত উচ্চ মাত্রার রেখা বলয়গুলিতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি সর্বাধিক হয়ে থাকে।



চিত্র 5.4 : গুজরাটের সমভূকম্পন রেখা মানচিত্র

#### 4. Earthquake Belt Map or Earthquake Prone Area Map : কোনো স্থানে ভূমিকম্প

প্রবণতার প্রকৃতি কীরূপ তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে Seismic Zone Map বা Earthquake Belt Map নির্মাণ করা হয়।

✱ কৌশল (Techniques) : Seismic Zone Map বা Earthquake Belt Map প্রস্তুতের জন্য যে কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করতে হয়, তা হল—

- প্রথমেই ভূমিকম্পপ্রবণ নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল নির্ধারণ করতে হয়। এখানে সংশ্লিষ্ট মানচিত্র অঙ্কনে ভারতের যে নির্দিষ্ট পরিসরকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার সামগ্রিক বিস্তৃতি হল 8° উত্তর থেকে 38° উত্তর অক্ষাংশ এবং 68° পূর্ব থেকে 100° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত।
- এরপর বিগত কয়েক দশকের মধ্যে ভারতে মোট যতগুলি ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রত্যেকটির উৎসস্থল এবং মাত্রা (Magnitude) সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এখানে BIS কর্তৃক 1883 খ্রিস্টাব্দ থেকে 2002 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ভূমিকম্পের অবস্থান এবং মাত্রা সংকলন করা হয়েছে।
- ভূমিকম্পের বলয় মানচিত্র নির্মাণ করার জন্য কোনও একটি অঞ্চলকে নির্দিষ্ট অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ ভিত্তিক অসংখ্য গ্রিডে বিভক্ত করা হয়। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি গ্রিডের একক ক্ষেত্রফল যত ছোটো হবে, ততই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিটি ভূমিকম্পের উৎসস্থল গুলিকে লিপিবদ্ধ করা যাবে। আবার গ্রিডের ক্ষেত্রফল যদি খুব বড়ো হয়ে যায়, তাহলে ভূমিকম্পের উৎসস্থল গুলির অবস্থান প্রদর্শনে কিছুটা ত্রুটি আসতে পারে। সেক্ষেত্রে সমগ্র মানচিত্র প্রদর্শনে সাধারণিকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।
- এখানে বছরের বিভিন্ন সময় উৎপন্ন প্রতিটি ভূমিকম্পের মধ্যে সর্বোচ্চ মানগুলিকেই একক হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যা ওই বছরটির ভূমিকম্পের 'Standard Maximum Observed Magnitude'-কে প্রতিনিধিত্ব করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি ভারতের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে বিগত 119 বছরে পৃথক পৃথকভাবে মোট যতগুলি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রতি বছরের সর্বোচ্চ ভূমিকম্পের মাত্রাটিকেই এখানে প্রতিনিধিত্বকারী রূপে ধরা হয়।
- এরপর গ্রিডভিত্তিক বিভিন্ন বছরে মোট কতকগুলি অনুভবযোগ্য বা সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প ঘটল, তাকে পরিসংখ্যায়িত করতে হবে বা গুনতে হবে।

প্রসঙ্গত, ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেহেতু ভূমিকম্পের সমস্ত তথ্যগুলি স্থান-কাল অনুযায়ী প্রতি মিনিট, ঘণ্টা কিংবা দিন অনুযায়ী যে-কোনো সময়ই পরিবর্তিত হতে পারে, তাই এখানে গ্রিডভিত্তিক ভূমিকম্পের মাত্রা প্রদর্শনে বেশ কতকগুলি জটিল গাণিতিক কৌশলের সাহায্য নেওয়া হয়। এগুলি হল—(a) Time Series Analysis, (b) Seismic Zone Factors, (c) Basic Seismic Coefficient, (d) Average Acceleration Coefficient, (e) Earthquake Energy Intensity, (f) Regression Relation প্রভৃতি।

- প্রসঙ্গত, ভূমিকম্পের মানচিত্রে উপকেন্দ্রগুলি প্রদর্শনে আমরা যদি দ্বিচলক রাশি ভিত্তিক Time Series Analysis Method-এর সাহায্য নিই, এখানে যে দুটি বিশেষ চলক (Variable) পাওয়া যাবে (যেমন—নির্দিষ্ট বছর এবং বছরভিত্তিক ভূমিকম্পের সর্বোচ্চ মাত্রা), তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে Least Square Method বা লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। এক্ষেত্রে a এবং b নামক দুটি ধ্রুবক সংখ্যা যে সমীকরণের মাধ্যমে পাওয়া গেছে, তা হল— $\sum y = Na + b\sum x$ ,  $\sum xy = a\sum x + b\sum x^2$ । এখানে সংশ্লিষ্ট

#### □ সারণি-1 □

MM Scale-এ তীব্রতার প্রকৃতি	ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল
<V	Zone I
VI	Zone II
VII	Zone III
VIII	Zone IV
IX	Zone V

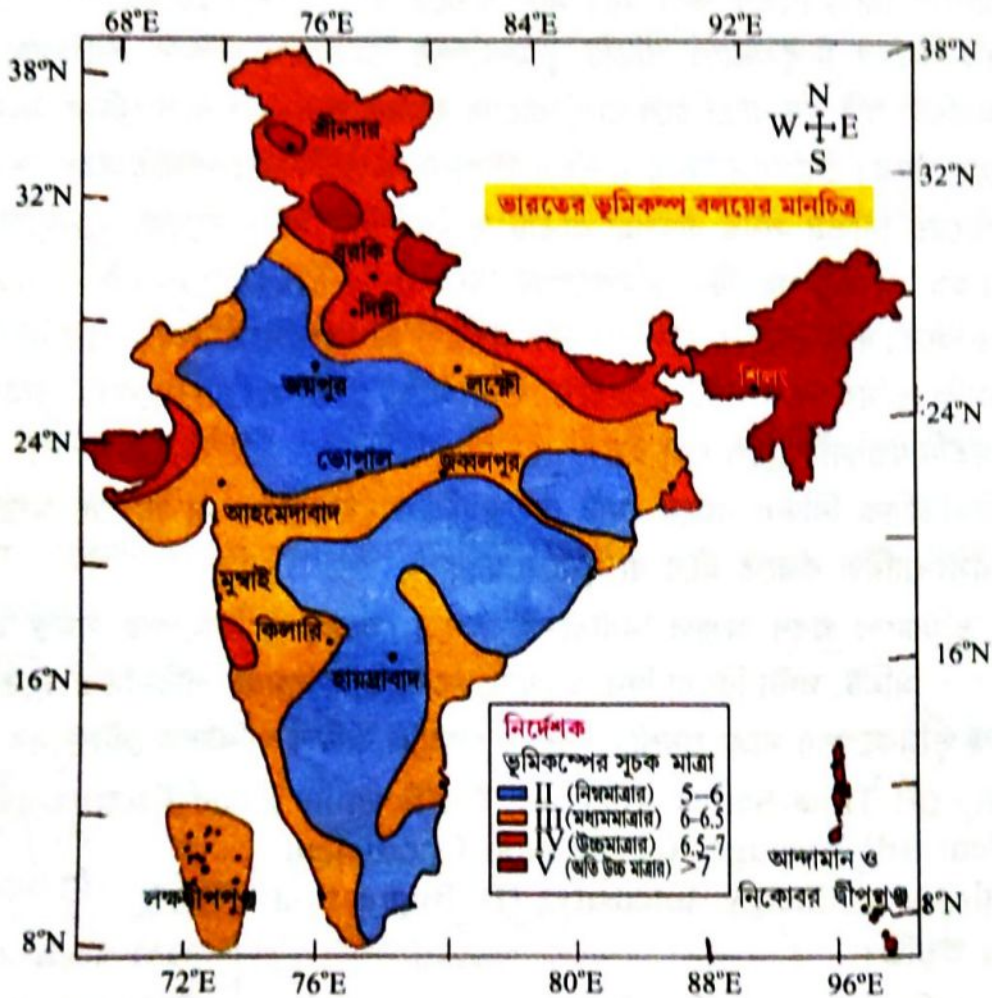


সমীকরণের মাধ্যমে পাওয়া  $b$  মানটি হল Time series method-এর 'Regression Relation'-এ পাওয়া  $M1$  বা 'Maximum Observed Magnitude' যা কোনো নির্দিষ্ট গ্রিডে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের সর্বোচ্চ মান।

(vii) এইভাবে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে পাওয়া সর্বোচ্চ intensity মাত্রার গড় মানগুলিকে বিভিন্ন গ্রিডে উপস্থাপন করার পর, প্রতিটি গ্রিডের মানের উপর নির্দিষ্ট ক্রমের 'Isopleth' অঙ্কন করলেই এক-একটি 'Earthquake Zone' পাওয়া যাবে।

(viii) সবশেষে "Earthquake Zone Map"-টিকে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রতিটি 'Index zone'-কে "Shed" কিংবা রঙ প্রয়োগ করা হয়। 'Bureau of Indian Standard' ভারতের ক্ষেত্রে যে ভূমিকম্পপ্রবণ বলয় মানচিত্র প্রকাশ করে থাকে, সেখানে 'Modified Mercalli Scale (MM-Scale)'-এর ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভিন্ন তীব্রতার অঞ্চল প্রদর্শন করে থাকে।

অবশ্য 2002 সালে ভারতের ভূমিকম্পের মানচিত্রে I এবং II নং zone-কে একত্রিত (Merge) করে মোট 4টি zone চিহ্নিত করা হয়েছে।



চিত্র 5.5 : ভারতের ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের মানচিত্র

# প্রাকৃতিক দুর্যোগ :

## শ্রেণিবিভাগ, মোকাবিলাত উপায়

(Natural Hazard : Classification, measures for mitigation)

# 1

মানুষের সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বছর পেরিয়ে এলেও প্রকৃতি-নির্ভরতাকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারেনি, অথবা প্রকৃতির অপার বৈচিত্র্য ও গভীরতাকে মানুষ সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠতেও পারেনি। তাই মাঝেমাঝেই ভয়ংকর বন্যা, খরা, ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, প্রভৃতির প্রকোপে মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এইসব ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আকস্মিক এবং দ্রুত প্রভাববিস্তারকারী, তাই সঠিক পূর্বাভাস বা উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অনেকক্ষেত্রেই মানুষের বিভিন্ন তথাকথিত উন্নয়নমূলক বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, প্রকৃতিকে বশ মানানোর নানা প্রচেষ্টা এবং দূষণ এই ধরনের দুর্যোগকে ত্বরান্বিত করে।

দুর্যোগকে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

- (1) কোনো বিপদের ঝুঁকি (Risk),
- (2) বিঘ্ন (Hazard)
- (3) ভয়ংকর বিপর্যয় (Disaster)

ধরা যাক, নদীর পাড়ে ভাঙন চলছে, গ্রামের মানুষের নদী-পাড়ের জমি একটু একটু করে নদী গ্রাস করে নিচ্ছে, যে-কোনো দিন পুরো গ্রামটিই ভেঙে নদীর গর্ভে চলে যেতে পারে, কিন্তু এখনও যায়নি। সরকারি/বেসরকারি উপায়ে প্রতি বছর দায়সারাভাবে পাড় বাঁধানোর চেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে সেই গ্রামের মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ আসন্ন বিপদের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

যদি ভূমিকম্প বা ভূমিধস ইত্যাদি ঘটার ফলে কোনো স্থানে আকস্মিকভাবে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং সম্পদের অল্পবিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে এলাকাটি বিঘ্ন (Hazard) পীড়িত বলতে হবে।

আবার যদি কোনো আকস্মিক টর্নেডো, সাইক্লোন বা সুনামি ঘটার ফলে অতি অল্পসময়ে বিস্তীর্ণ জায়গাজুড়ে অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে, অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবর্তন হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে সেই ধরনের দুর্যোগকে ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা প্রলয় (disaster) বলা হয়।

প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও উদ্যোগের অভাব, সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও শিক্ষার অভাব, ধর্মভীরুতা ও নিয়তি-নির্ভর নিশ্চেষ্টতা, দুর্যোগ মোকাবিলায় যথেষ্ট শক্তি ও সম্পদের যোগানের অভাব— ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষের বিপন্নতা বা vulnerability বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ আসন্ন বিপদকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। বিপন্ন মানুষের সংখ্যা এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে রক্ষিত সম্পদের পরিমাণ যত বেশি হবে বিপদের ঝুঁকিও ততই বাড়বে। এরপর বিপদ ঘটে গেলে অনেকক্ষেত্রে পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বিঘ্নের সীমা ছাড়িয়ে বিপর্যয়ে পরিণত হয়। উন্নয়নশীল বিশ্বে, অপরিবর্তিত উন্নয়ন, প্রচুর জনসংখ্যা, জীবনযাত্রার নিম্নমান, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অত্যাবশ্যিকীয় পরিসেবার ও জীবনদায়ী চিকিৎসার অপ্রতুলতা সহজেই জীবন ও সম্পদহানির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং পৃথিবীর দুর্যোগপূর্ণ ঘটনার পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায়, বিপর্যয়ের সংখ্যা, মাত্রা সবকিছুই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেশি ঘটেছে। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বে দুর্যোগ মোকাবিলার উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রশাসনিক সদিচ্ছা থাকায়, খুব কম দুর্যোগই বিপর্যয়ে পরিণত হয়। দুর্যোগ বিষয়ক আন্তর্জাতিক রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় যে 1970 থেকে 1995-এর মধ্যে এশিয়া মহাদেশের 123 মিলিয়ন মানুষ এবং আফ্রিকার 12 মিলিয়ন মানুষ ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে।

গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে গেলে বলা যায় যে, বিঘ্ন (hazard) এবং বিপর্যয় (disaster)-এর মধ্যে সীমারেখা টানা সহজ নয়।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীলকুমার মুন্সীর (2007) মতে— 'Though our mega environment has been more or less stable, minor deviations from this normal state cause deviation in human adaptation. Such deviations in nature beyond normal expectation is generally called hazard.'

ভূমিরূপবিদ অধ্যাপক সাবিন্দ্র সিং (2001) -এর মতে— 'Hazards are generally taken to be the processes, (causal factor) and the responses (Results) of extreme events, both natural and anthropogenic, which cause an accident/extreme events/or danger.'

অল্প কথায় বিঘ্ন বা hazard-এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(1) পরিবেশের সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুতি যদি মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত করে তবে তা হল বিঘ্ন বা hazard।

ছাত্রছাত্রীরা মনে রাখবে বিঘ্ন বা hazard শুধু যে মানুষের জীবনকেই প্রভাবিত করবে তা নাও হতে পারে, জীবজন্তু, গাছপালা, কীটপতঙ্গ—সংক্ষেপে জীবজগতের যে-কোনো অংশই বিঘ্নের ফলে বিপদে পড়তে পারে। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে ও বায়ুমণ্ডলে ঝড়ঝঞ্ঝা চলতে পারে। কিন্তু সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব নেই। তাই সেই ঘটনাগুলি কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ঘটনার রকমফের। বস্তুত, পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলেই স্বাভাবিক পরিবেশের যে-কোনো বিচ্যুতি প্রাণ বা প্রোটোপ্লাজমকে বিপদের সামনে দাঁড় করাতে পারে। তাই পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই ধরনের বিচ্যুতি বিঘ্ন বা hazard রূপে গণ্য হবে।

(2) বিঘ্ন বা hazard-এর উৎপত্তি এবং প্রভাবিত এলাকা, বিপর্যয়ের তুলনায়, অল্প আয়তন অধিকার করে। সুতরাং, বিপর্যয় বা disaster-এর তুলনায় hazard ক্ষুদ্র স্কেলে সংঘটিত হয়।

(3) যে-কোনো বিঘ্ন বা hazard-এর জন্য নানারকম প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদান পৃথকভাবে বা সংযুক্তভাবে দায়ী হতে পারে। সুতরাং এধরনের ঘটনা ঘটার পর প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক দু'ধরনের সম্পদই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এবারে দেখা যাক, দেশবিদেশের নানা বিশেষজ্ঞ বিপর্যয় বা disaster-কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

(a) ফ্রেডরিক ক্রিমগোল্ড (Fredrick Krimgold) 1976 সালে, তাঁর 'Overview of the priority area Natural Disaster' (United Nations, New York) বইতে বিপর্যয়ের সংজ্ঞা দেন এইভাবে— 'Disaster is a crisis event which outstrips the capacity of society to manage or cope with it at least for a time.'

(b) 1989 সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়— 'Disaster is an extraordinary event of limited duration or strictly speaking, a natural event causing serious disruption of country's economy.'

(c) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে— 'a disaster is any occurrence causing damage, ecological disruption, loss of human lives, deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant any extraordinary intervention from outside the affected community (Ref. Lazzari Stefano, 1990, Health aspects of disaster preparedness and response, WHO Health for all when a disaster

strikes, Vol. 2).

সহজ কথায় বিপর্যয় বা disaster-এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- (a) বিপর্যয় আকস্মিক ও দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী।
- (b) বিপর্যয়ে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদহানি ও বিপুল সংখ্যার মানুষের জীবনহানি হয়। তবে সম্পদ ও জীবনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ সহজ নয়। বিভিন্ন সময়, পরিস্থিতি ও দেশভেদে এই পরিমাপের পার্থক্য হয়। 2001 সালের World Disaster Report-এ বলা হয়— কোনো দুর্ঘটনা তখনই বিপর্যয় বলে গণ্য হবে যখন—
  - (1) দশ বা তার বেশি মানুষের মৃত্যু হবে।
  - (2) একশো বা তার বেশি মানুষ আহত হবে।
  - (3) পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্যের দরকার হবে।
  - (4) সরকারিভাবে আপৎকালীন পরিস্থিতি ঘোষিত হবে।

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা (Natural Hazard Research Group) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে— কোনো দুর্ঘটনায় কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ হানি, অন্তত একশো মানুষের মৃত্যু এবং একশো মানুষ আহত হবে, তাকে বিপর্যয় বলা হবে (Basu, 2007)।

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Belgium বড় বিপর্যয়ের সংজ্ঞা দেন এইভাবে—

- (1) অন্তত 100 মানুষের মৃত্যু হবে,
- (2) দেশের জাতীয় GDP-এর এক শতাংশ বা তার বেশি পরিমাণে ক্ষতি হবে,
- (3) দেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ বা তার বেশি আক্রান্ত হবে (Smith & Petley, 2007)।

## দুর্যোগের সৃষ্টি

পরিবেশে দুর্যোগ সাধারণত তিনভাবে ঘটতে পারে—

- (1) কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সংঘটিত দুর্যোগ (Natural Hazards)।
  - (2) প্রাকৃতিক শক্তি এবং মানুষের কার্যকলাপ উভয়েই যার জন্য দায়ী এমন দুর্যোগ (Quasi Natural Hazard)।
  - (3) কেবলমাত্র মানুষের অপরিণামদর্শিতার ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ (Manmade Hazards)।
- ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি প্রভৃতি দুর্যোগ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক

### 11.1.1 বিপর্যয় নিয়ে দ্বিমত (Disagree with the disaster) :

বন্যার মতো নদীপাড় ক্ষয়ের বিষয়টিকে অনেক বিশেষজ্ঞই বিপর্যয় মানতে দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছেন। কারণ বিগত দুই দশক আগেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নদীপাড়ের ক্ষয়কে দুর্যোগ ধরাই হত না। বিশেষ করে কোনো কোনো ভৌগোলিক মনে করেন, নদী পাড়ের ভাঙা-গড়ার খেলাটি আসলে নদীপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের সামঞ্জস্যবিধান মাত্র। সমস্ত নদীপাড় বিশ্লেষণেই দেখা গেছে, নদীর একদিকের পাড় যেমন ক্ষয়ের মাধ্যমে সংকীর্ণ হয়েছে, একইভাবে নদীর বিপরীত দিকের পাড়টি সঞ্চারকার্যের প্রাধান্যে অত্যন্ত প্রশস্ত হয়ে উঠে পারস্পরিক ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে।



চিত্র-11.2 : নদীপাড় ক্ষয়ের বিভিন্ন অবস্থা

তবে, সাম্প্রতিককালে বন্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিটি নদী অববাহিকায় এই ধরনের পাড় ক্ষয় সংক্রান্ত দুর্যোগ যেভাবে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার বহু গ্রাম বা শহর, চাষযোগ্য জমি, ভূসম্পত্তি পুরোপুরি নদীখাত বরাবর তলিয়ে গেছে।

এমনকী এই ধরনের ঘটনাগুলিতে অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি, অনেকে প্রাণও হারিয়েছেন। এই সমস্ত ভয়াবহ বিপদের পরেও যে কয়েকজন মানুষ বেঁচে গেছেন, সেখানে তারা সহায়-সম্বলহীন হয়ে ক্রমশ বুভুক্ষু ভিখারিতে উপনীত হয়েছেন। সামগ্রিকভাবে মানুষের এই অসহায় পরিণতি দেখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নদীপাড় ক্ষয়কে দুর্যোগরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশেষ করে 2015 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার *International Federation of Red Cross and Red Crescent Society*-র প্রধান **Bob Macrow** নদীপাড়ের ক্ষয়কে "Slow, Silent Disaster" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

### 11.1.2 নদীপাড় ক্ষয়ের মাত্রা (Dimension of riverbank erosion) :

যে-কোনো নদীর পাড় বরাবর ক্ষয়কার্যের মাত্রা তিন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন—

- (1) **মস্তকমুখী ক্ষয় (Headward erosion) :** নদীর মস্তকমুখী ক্ষয়কার্য মূলত নদীপ্রবাহের সামনের দিকগুলিতে ঘটে থাকে। এই ধরনের প্রভাবে নদী দৈর্ঘ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তবে, নদী-অববাহিকা অঞ্চলের অন্যান্য জলধারাও মস্তকমুখী ক্ষয় করে নদীপাড়গুলিকে বিধ্বস্ত করে। সাধারণত যে সমস্ত নদ-নদীর জলধারণ ক্ষমতা যত বেশি, তার মস্তকমুখী ক্ষয়ের মাত্রাও তত বেশি। অনেক সময় অধিক মস্তকমুখী ক্ষয় প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে নদীগ্রাস (River capture)-এর মতো ঘটনা ঘটে, যা নদীপাড় ভাঙনের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দেয়।



চিত্র-11.3 : নদীপ্রবাহের দ্বারা মস্তকমুখীক্ষয়

- (2) **উল্লম্ব ক্ষয় (Vertical erosion)** : নদীপাড়ের উল্লম্ব ক্ষয় সর্বাধিক পরিমাণে লক্ষ করা যায় নদীর উচ্চগতিতে। এখানে ভূমির ঢাল সবচেয়ে বেশি থাকে বলে, নদীর প্রবল শক্তি উল্লম্ব ক্ষয়ে সহায়ক হয়ে ওঠে। কোনো নদীতে উল্লম্ব ক্ষয়ের মাত্রা বেশি থাকলে, নদীপাড়ের সর্বোচ্চ অংশ এবং নদীখাতের সর্বনিম্নাংশের মধ্যে উচ্চতাগত ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে।



চিত্র-11.4 : নদীপাড়ের উল্লম্ব ক্ষয়



চিত্র-11.5 : নদীপাড় বরাবর উল্লম্ব এবং পার্শ্বীয় ক্ষয়

- (3) **পার্শ্বীয় ক্ষয় (Lateral erosion)** : পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নদী-অববাহিকায় পার্শ্বীয় ক্ষয়প্রবণতাই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের সৃষ্টি করে থাকে। নদীর মধ্য এবং নিম্ন গতি প্রবাহে এই ধরনের পার্শ্বীয় ক্ষয়ে পার্শ্ববর্তী জনপদগুলিকে ক্রমশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

### 11.1.3 নদীপাড় ক্ষয়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of River Bank Erosion) :

নদীপাড় ক্ষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- নদী অববাহিকা অঞ্চলে ভূমিগ্রাস এবং ভূমিধসের একটি সমন্বয়ী রূপ হল নদীপাড়ের ক্ষয়।
- নদীখাত এবং পাড় মধ্যস্থ শিলাস্তর বরাবর স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক পীড়ন নদীপাড় ক্ষয়ে কার্যকরী হয়।
- নদীপাড় ক্ষয়ের নিয়ত প্রক্রিয়া বছরের প্রায় সমস্ত সময় ধরেই কমবেশি চলতে থাকে।
- অনেকসময় নদীপাড় ক্ষয় এত ধীরগতিতে ঘটে, যাকে খালি চোখে সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না।
- নদীপাড় ক্ষয়ে নদীর গতিপথের ভাঙা-গড়ার ভারসাম্য বজায় থাকলেও, জনজীবনের নিরিখে এটি একটি দুর্ভোগবহুল প্রতিকূল পরিস্থিতি।
- মানুষের বাসস্থান ও জীবিকাসংস্থানের দিক থেকে নদীপাড় ক্ষয় একটি সার্বিক 'কীর্তিনাশা' প্রক্রিয়া।
- নদীপাড় ক্ষয়ের ফলে নদীখাতগুলি আয়তনে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে জনবসতি অঞ্চলের দিকে সরে যায়।

➤ **দৃষ্টান্ত (Example)** : আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি নদীপাড় ক্ষয় বিধ্বস্ত

দেশ। এদেশে বিগত চার দশকে প্রায় 71,610 হেক্টর জমি নদীগর্ভে চলে গেছে, যা এখানকার একটি গোটা জেলার প্রায় সমান। ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলেও নদীর পাড়গুলি বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় ধরে ব্যাপক ক্ষয়ের কবলে পড়ে। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্ষয়ের ঘটনায় প্রতিবছর প্রায় অসংখ্য মানুষ চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়। এখানকার নদীপাড় ক্ষয়ে বিপর্যস্ত কয়েকটি জেলা হল—মালদহ, মুরশিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি। এ ছাড়াও ভারতের অপর একটি উল্লেখযোগ্য নদীপাড় ক্ষয় বিধ্বস্ত অঞ্চল হল অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা।

### □ সারণি-1 : ব্রহ্মপুত্র নদের পাড় ক্ষয় সমীক্ষা □

সমীক্ষার সময়কাল	ক্ষয়প্রাপ্ত ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকার আয়তন
1. প্রথম সমীক্ষা (1912-28)	3,870 Km <sup>2</sup>
2. দ্বিতীয় সমীক্ষা (1963-75)	4,850 Km <sup>2</sup>
3. তৃতীয় সমীক্ষা (2006)	6,080 Km <sup>2</sup>

Source : NESAC

সরাসরি নদীপাড় ক্ষয়ে প্রভাব বিস্তার করে। **যেমন**—আর্দ্র ঋতুতে অধিক জলপ্রবাহ নদীপাড় ক্ষয় বৃদ্ধি করে।

- (5) **নদীর বোঝা (River load)** : নদীর অতিরিক্ত বোঝা পরোক্ষভাবে নদীর শক্তি বৃদ্ধি করে নদীপাড় ক্ষয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।
- (6) **শিলার প্রকৃতি (Nature of rock)** : নদীপাড়-মধ্যস্থ শিলার কাঠিন্যতা (hardness) বা কোমলতা (softness) সরাসরি নদীপাড় ক্ষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। **যেমন**—কোমল শিলাস্তর গঠিত নদীপাড়গুলি কঠিন শিলাস্তরের নদীপাড়ের চেয়ে দ্রুত এবং অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত পায়।
- (7) **নদী বাঁক (Meandering)** : নদী যখন অধিক বাঁক-বিশিষ্ট হয়, তখন পাড়গুলিতে নদীপ্রবাহের জল বেশি পরিমাণে বাধা পায়, যা নদীপাড় ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে।

নদীপাড় ক্ষয়ের মাত্রা ↓ উচ্চ ↓ মধ্যম ↓ অধিক					
নদীপাড় ক্ষয়ের প্রভাব	নদীপাড়ের উচ্চতা বনাম নদীপাড়ের গভীরতা	নদীপাড়ের কৌণিক ভঙ্গি	শিকড়যুক্ত এবং শিকড়বিহীন নদীপাড়ের ক্ষয়ের প্রবণতা	স্তরবিহীন এবং স্তরিত মৃত্তিকায়ুক্ত নদীপাড়	নদীপাড়ের উপাদানগত আয়তন

চিত্র-11.10 : নদীপাড়ের বিভিন্ন প্রকৃতি এবং ক্ষয়ের মাত্রা

প্রসঙ্গত, 1998 খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ **Kinghton** নদীপাড় ক্ষয়ে সহায়তাকারী যে কয়েকটি বিশেষ উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি হল—

- (i) **নদীখাতের জ্যামিতি (Geometry of riverbed)** : **যেমন**—নদীর গভীরতা, নদীখাতের ঢাল, নদীখাতের বিস্তৃতি, বাঁকের বক্রতার পরিমাণ, নদীপাড়ের উচ্চতা ও কৌণিক পরিমাণ প্রভৃতি।
- (ii) **প্রবাহের প্রকৃতি (Nature of stream)** : **যেমন**—নদীর জলপ্রবাহের মাত্রা, জলধারার বিস্তৃতি, ঘূর্ণিসৃষ্টি, জলের আন্দোলন, জলনির্গমনের সময়গত পার্থক্য প্রভৃতি।
- (iii) **জলবায়ু (Climate)** : **যেমন**—বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্ব, ঘনত্ব, বন্টন, শীতলীকরণ হার, উষ্ণতা-আর্দ্রতাভিত্তিক চক্র প্রভৃতি।
- (iv) **উপপৃষ্ঠীয় অবস্থা (Surface condition)** : **যেমন**—পৃষ্ঠপ্রবাহের প্রকৃতি, পৃষ্ঠপ্রবাহের চাপ, মাটির আর্দ্রতাগত মাত্রা, জলসরবরাহের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি।
- (v) **জৈবিক প্রভাবক (Organic factors)** : **যেমন**—উদ্ভিদের আস্তরণ ও তার ঘনত্ব, মৃত্তিকাস্থিত প্রাণীদের অবস্থান, মানবীয় কার্যাবলি প্রভৃতি।



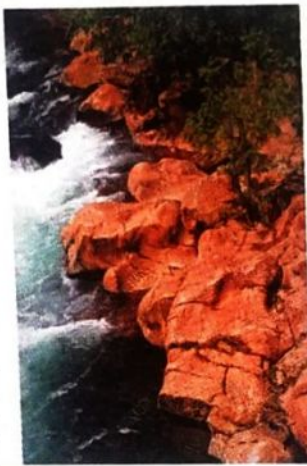
### 11.1.6 নদীপাড় ক্ষয়ের কারণসমূহ (Causes of riverbank erosion) :

নদীপাড় ক্ষয়ের পরিস্থিতির জন্য একাধিক প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণকে দায়ী করা যায়, এগুলি হল—

#### □ প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Natural Causes)

1. **জলপ্রবাহের প্রকৃতি (Nature of streams) :** প্রাথমিকভাবে নদীপাড় ক্ষয়ের অন্যতম কারণরূপে নদী শক্তির মাত্রাগত প্রকৃতি বিশেষভাবে জড়িত। প্রতিটি নদীখাত সংলগ্ন অঞ্চলে জলপ্রবাহের একটি নির্দিষ্ট বেগ বা স্বাভাবিক মাত্রা থাকে। কিন্তু কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে এই জলপ্রবাহ অস্বাভাবিক আকার ধারণ করলে, জলের প্রবল আঘাত সংশ্লিষ্ট নদীপাড়গুলিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রসঙ্গত, নদীখাতে অতিরিক্ত জলপ্রবাহ নদীপাড়ে যে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, তা সহ্য করতে না পেরে পাড়ের দুর্বল অংশগুলিতে একাধিক ছোটো ছোটো ফাটল সৃষ্টি হয়। এই ফাটলগুলি আয়তনে ক্রমশ বেড়ে নদীপাড়ের ক্ষমতাকে যখন বিনষ্ট



চিত্র-11.11 : নদীপাড়ের জলপ্রবাহ ক্ষয়

করে দেয়, যখন শেষপর্যন্ত পাড়ের দুর্বল অংশগুলি নদীতে খসে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, খসে পড়া পাড়ের অংশ নদীখাতে ক্রমান্বয়ে জমতে থাকলে, তাতে জল ধাক্কা খেয়ে সাময়িক ঘূর্ণিতে পরিণত হয়, যা নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

2. **জলবায়ুগত প্রভাব (Climatic factors) :** নদীপাড় ক্ষয়ের ক্ষেত্রে জলবায়ুগত প্রভাবকগুলি সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে, কোনো নদী-অববাহিকা অঞ্চলে যদি অধঃক্ষেপণের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে বৃষ্টিপাত বা তুষারগলা জল একাধিক ছোটো ছোটো খাতে বিভক্ত হয়ে পাড়ের মধ্য দিয়ে নদীতে গিয়ে মেশে। এর ফলে নদীপাড়গুলি দ্রুত ধুয়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **যেমন—**প্রতিবছর বর্ষাঋতুতে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই কারণে নদীপাড় ক্ষয়ের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

3. **নদীর প্রকৃতি (Nature of river) :** আমরা আগেই জেনেছি, নদীপাড় ক্ষয়ে নদীর প্রকৃতিগত উপাদানগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নদীর প্রকৃতি সংক্রান্ত যেসমস্ত বিষয় নদীপাড় ক্ষয়ে সরাসরি প্রভাব ফেলে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

(i) নদীখাত অগভীর এবং মসৃণ হলে প্রবাহিত অতিরিক্ত জলের ধাক্কা নদীখাত প্রতিহত করতে পারে না, ফলে পাড় ক্ষয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। **যেমন—**বিহারের কোশি নদী অববাহিকায় এই অবস্থা দেখা যায়।

(ii) যে সমস্ত নদীতে অসংখ্য অবতল বাঁক রয়েছে, নদীজল তাতে বাধা পেয়ে ঘূর্ণির আকারে নদীপাড় ক্ষয়ে অংশ নেয়। **যেমন—**গঙ্গা মুরশিদাবাদের কাছ থেকে প্রবেশ করার পর যে অসংখ্য বাঁক সৃষ্টি করেছে, তার প্রভাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক নদীপাড় ক্ষয় ঘটতে দেখা যায়।

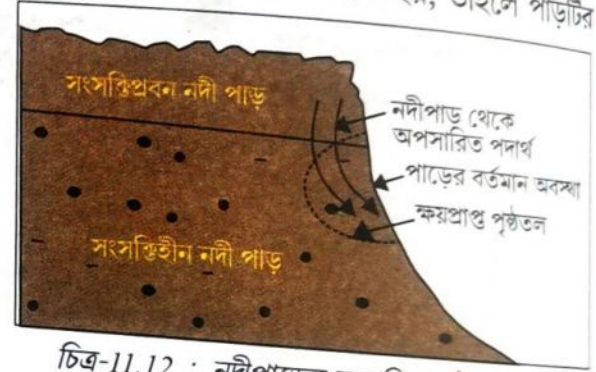
(iii) নদীবক্ষে যদি একাধিক চরের উপস্থিতি থাকে, তাহলে চরগুলিতে নদী প্রবাহ বাধা পেয়ে ক্ষয়কারী

শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। যেমন—অসমের ব্রহ্মপুত্র নদে এই ধরনের ক্ষয়প্রবণতা সর্বাধিক হারে লক্ষ করা যায়।

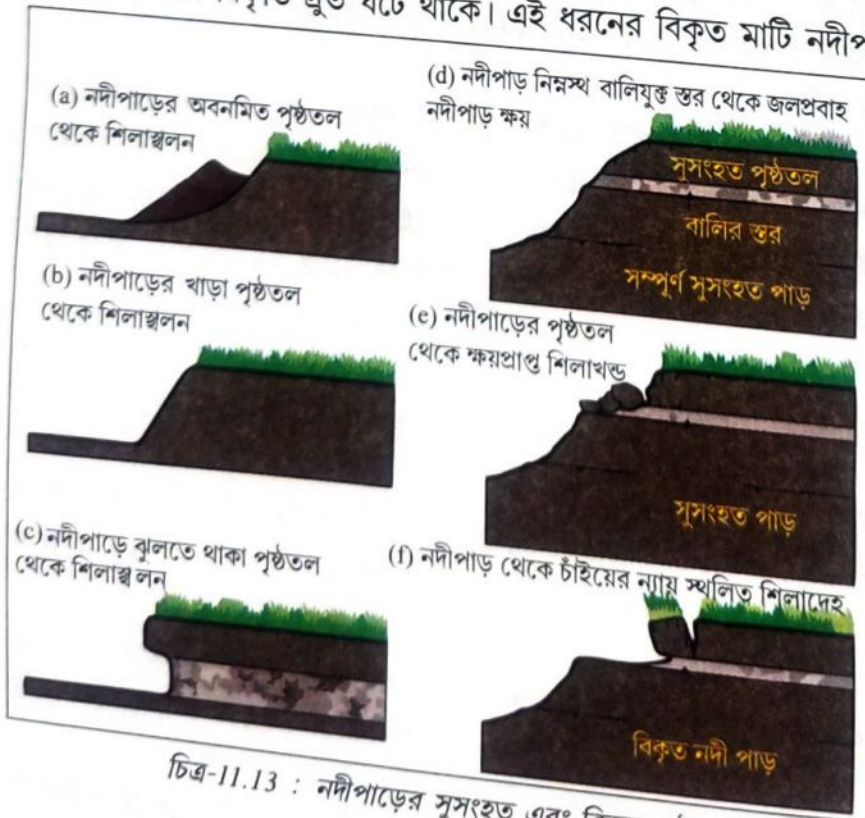
- (iv) নদীপাড়গুলি যদি কোমল শিলায় গঠিত হয়, তাহলে নদীপাড় দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেমন—কোমল শিলায় গঠিত উত্তর ভারতের অধিকাংশ নদীপাড় এই কারণে যথেষ্ট ক্ষয়গ্রস্ত।
- (v) নদীর যত পরিণতি প্রাপ্তি ঘটে, ততই নদীখাতের বক্রতা, প্রশস্ততা, জলের পরিমাণ, এমনকি জলের বোঝার পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায়। সম্মিলিত এই প্রত্যেকটি পরিস্থিতিই নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রাকে যথেষ্ট বাড়িয়ে দেয়। যেমন—গঙ্গার মোহনা সংলগ্ন অংশের নদীপাড় ক্ষয়ে উল্লিখিত পরিস্থিতি বিশেষভাবে দায়ী।

**4. ভূতাত্ত্বিক গঠন (Geological structure) :** নদী-অববাহিকা অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন নদীপাড় ক্ষয়ের সম্ভাবনা তৈরি করে। সাধারণত যদি কোনো নদীপাড় ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে অস্থিতিশীল হয়, বিশেষ করে সেটি দারণ, চ্যুতিবিশিষ্ট, প্রবেশ্য কিংবা আলাগা প্রকৃতির গঠন বিশিষ্ট হয়, তাহলে পাড়টির ক্ষয়প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট নদীপাড়টি ক্রমাগত জলের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে কোনও একসময় নদীখাত বরাবর ধসে পড়ে।

**5. মৃত্তিকার প্রকৃতি (Nature of soil) :** মাটির প্রকৃতির সঙ্গে ভূমিক্ষয়ের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণত নদীপাড় মধ্যস্থ মাটির প্রথন যদি দুর্বল হয়, বিশেষ করে মাটি আলাগা, ভঙ্গুর বা ছিদ্রযুক্ত কোমল প্রকৃতির হলে—জলের দ্বারা তার বিকৃতি দ্রুত ঘটে থাকে। এই ধরনের বিকৃত মাটি নদীপাড়ের দ্রুত ক্ষয় ঘটিয়ে পাড়ের ভারসাম্য



চিত্র-11.12 : নদীপাড়ের ভূতাত্ত্বিক গঠন ও ক্ষয়ের পৃষ্ঠতল



চিত্র-11.13 : নদীপাড়ের সুসংহত এবং বিকৃত গঠন

বিঘ্নিত করে। যেমন—নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার দুর্বল শিলায় গঠিত নদীপাড়গুলি প্রবল বর্ষায় দ্রুতহারে ক্ষয় পেয়ে থাকে।

**6. উদ্ভিদের স্বল্পতা (Lack of Vegetation) :** সাধারণত উদ্ভিদের শিকড় মাটিতে আঁকড়ে ভূমিক্ষয়কে প্রতিরোধ করে থাকে। কিন্তু নদীপাড় সংলগ্ন অঞ্চলে উদ্ভিদের পরিমাণগত অভাব থাকলে, মাটি অসংলগ্ন অবস্থায় রয়ে যায়, ফলে নদীপাড়ের ক্ষয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

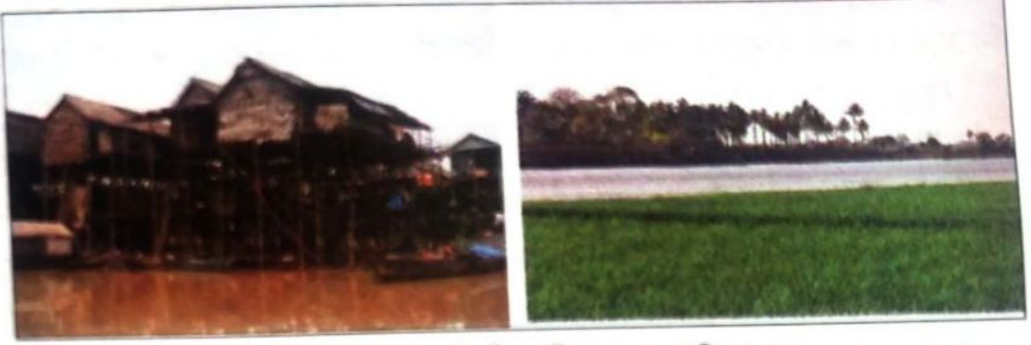
এ ছাড়াও, যে সমস্ত নদীপাড় প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিঝড় বা সুনামির সম্মুখীন হয়, তার ক্ষয়ের মাত্রা উল্লিখিত সমস্ত ঘটনাগুলিকে ছাপিয়ে যায়।

## □ মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহ (Man-made Causes)

নদীপাড় ক্ষয় যে শুধু প্রাকৃতিক কারণে ঘটে তেমনটা নয়, বেশ কিছু মনুষ্যসৃষ্ট কারণও নদীপাড় ক্ষয়ে সরাসরি জড়িত। এগুলি হল—

### 1. জনবসতির বিস্তার (Settlements expansion) : নদীপাড় ক্ষয়ের মনুষ্যসৃষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

কারণ হল নদীপাড় সংলগ্ন অঞ্চলে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় জনবসতির বিস্তার। পৃথিবীতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্থান সংকুলানের অভাবকে দোহাই



চিত্র 11.14 : নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ভূমিব্যবহার

দিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত অপরিবর্তিতভাবে নদীপাড় বরাবর বসতি নির্মাণ করে চলেছে। এর ফলে নদীপাড়ের ওপর চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষয়সংক্রান্ত দুর্ঘটনাকে অনিবার্য করে তুলেছে।

### 2. কৃষিকাজ (Agriculture) : সাধারণত নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি ফসল ফলানোর উপযোগী উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ হওয়ার, এখানে ব্যাপকভাবে কৃষিকাজ করা হয়ে থাকে। কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে অনিয়ন্ত্রিত ভূমিকর্ষণ, জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, মাটি কেটে জমিতে আল দেওয়া প্রভৃতি কারণগুলি নদীপাড় ক্ষয়ের সম্ভাবনাকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয়।

### 3. অবৈধ নির্মাণ (Illegal construction) : বেশির ভাগ নদীপাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবেষ্টিত স্থানগুলিতে ব্যাণ্ডের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা পিকনিক স্পটকে কেন্দ্র করে একাধিক হোটেল বা লজ, রাস্তাঘাট অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়। এই সমস্ত অবৈধ নির্মাণকাজ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যে ভয়াবহ নদীপাড় ভাঙনের পরিস্থিতি তৈরি করে, তার অনিবার্য ফল ভুগতে হয় সংশ্লিষ্ট নদীপাড়ে থাকা জনবসতিগুলিকে।

### 4. বনভূমি বিনাশ (Deforestation) : নদীপাড় বরাবর রাস্তাঘাট নির্মাণ, নতুন বসতি বা দোকানবাজার নির্মাণ, কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতির ফলে প্রচুর পরিমাণে বনভূমি বিলোপ করা হয়। এর ফলে নদী পাড়-সংলগ্ন মাটি ক্রমশ আলগা হয়ে গিয়ে ক্ষয়ের মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি করে।

### 5. পশুচারণ (Grazing) : নদীপাড় বরাবর অতিরিক্ত পশুচারণের ফলে সেখানকার মাটিতে ছোটো ছোটো গর্তের সৃষ্টি হয়। এই গর্তগুলিতে জল জমতে থাকলে সেগুলি আয়তনে বেড়ে যায় এবং কালক্রমে পাড়ে ফাটল ধরায়। সেই ফাটলগুলিই জলধারার ক্রমাগত আঘাতে একসময় নদীবক্ষ বরাবর স্থলিত হয়।

### 6. শিল্পজাত বর্জ্য (Industrial wastages) : অধিকাংশ শিল্প-কারখানাগুলি বড়ো বড়ো নদী-তীরবর্তী অঞ্চল বরাবর গড়ে ওঠে। এই সমস্ত শিল্পকেন্দ্রগুলির উৎপন্ন বর্জ্যের অনেকটাই নদীপাড়গুলিতে ফেলা হয়। এর ফলে নদীপাড় সংলগ্ন স্থানগুলির মাটির দৃঢ়তা নষ্ট করে দিয়ে ক্ষয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

### 7. স্নানের ঘাট (Bathing ghat) : পৃথিবীর অধিকাংশ নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষ তাদের বিভিন্ন নিত্যক্রিয়া (শৌচ কর্ম, স্নান, জামা কাপড় কাচা প্রভৃতি) সম্পন্ন করার জন্য, নদীপাড় বরাবর অস্থায়ী স্নানের ঘাট বেঁধে থাকে। এর প্রভাবে নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রা যথেষ্ট হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন—গঙ্গার উভয় পাড়ে এই ধরনের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

## 11.2 নদীপাড় ক্ষয়ের বিপন্নতা (Vulnerability of riverbank erosion) :

নদীপাড় ক্ষয়ের সমস্যাটি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মহাদেশেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রতিদিন একটু একটু করে ঘটতে থাকা নদীপাড়ের ক্ষয় মানুষকে একাধিক বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তাদের সহায়সম্বলহীন করে তোলে। নদীপাড় ক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের এই ধরনের বিপন্নতা একাধিক কারণে নেমে আসে, যেমন—

**প্রথমত**, সভ্যতা গঠনের শুরু থেকেই বসতি নির্মাণের কেন্দ্রস্থলরূপে মানুষ নদী-তীরবর্তী স্থানগুলিকে বেছে নিয়েছিল। তাই মানুষের বাসস্থানের পরিসরটিতে এই নদীপাড় ক্ষয়ের বিপন্নতা সর্বাধিক গ্রাস করেছে।

**দ্বিতীয়ত**, প্রায় সমস্ত নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি হল চাষাবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুকূল স্থল। মানুষের খাদ্য উৎপাদনের জন্য এই এলাকাটির ওপর অধিক নির্ভরশীলতা অনেকক্ষেত্রে বিপন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

**তৃতীয়ত**, মানুষ নদীপাড়ের আশেপাশের অঞ্চলকেই জীবিকানির্বাহের জন্য বেছে নেয়। কিন্তু প্রতিনিয়ত নদীপাড় ভাঙন সংক্রান্ত পরিস্থিতি মানুষের জীবিকাগত ক্ষেত্রটিকেও বিপন্ন করে তোলে।

কাজেই যেখানে মানুষের জীবন ও জীবিকা সার্বিকভাবে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, সেখানে বিপন্নতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। নদীপাড় ক্ষয়ের পৃথিবীব্যাপী বিপন্নতার প্রতিচ্ছবি নিম্নলিখিত বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তে আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

- (i) কোনো ভূখণ্ডকে নদী একবার যদি গ্রাস করে ফেলে, তাকে পূর্বের অবস্থায় পুনরায় ফিরিয়ে আনা কখনোই সম্ভব হয় না।
- (ii) সমস্ত দুর্বল নদীপাড় এলাকা বরাবর দীর্ঘকাল ধরে অনবরত ক্ষয়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।
- (iii) সমগ্র পৃথিবীর স্থলভাগের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতি বছর গড়ে 26.4 বিলিয়ন টন মাটির অপসারণ ঘটে থাকে, যার সিংহভাগই নদীপাড় ক্ষয়ের সঙ্গে জড়িত।
- (iv) নদীপাড় ক্ষয়ের প্রভাবে পৃথিবীব্যাপী প্রায় কয়েকহাজার মানুষ তাদের বসতি অঞ্চল থেকে বিচ্যুত হয়।
- (v) পৃথিবীর আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলভিত্তিক নদীপাড় ক্ষয়ের গড় হার 30-60 বর্গকিমি/বছর।
- (vi) পৃথিবীর যাবতীয় দেশের মধ্যে নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রা সর্বাধিক। বিগত তিরিশ বছর ধরে বাংলাদেশ যে পরিমাণ জমি নদীপাড় ক্ষয়ের মাধ্যমে হারিয়েছে, তার মোট পরিমাণ সেখানকার একটা বড়ো জেলার মোট আয়তনের সমান।
- (vii) ভারতের গঙ্গা নদীর ধারণ-অববাহিকার 1.09 মিলিয়ন বর্গকিমি স্থানের প্রায় 15-20% এলাকা সর্বাধিক ক্ষয়প্রবণ।
- (viii) নদীপাড় ক্ষয়ের জন্য ভারতের শুধুমাত্র অসম উপত্যকা বিগত কয়েক দশকে তার মোট ভূখণ্ডের প্রায় 7.4% অংশ হারিয়েছে।
- (ix) নদীপাড় ক্ষয়ের প্রভাবে পৃথিবীর মোট কৃষিজমির প্রায় 2-5% ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- (x) ক্রমাগত নদীপাড় ক্ষয়ের পরিস্থিতি পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে থাকে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, চীন, ব্রাজিল প্রভৃতি।

### 11.2.1 মহাদেশভিত্তিক ক্ষয় প্রবণতা ও বিপন্নতা (Continent-based erosional tendency and vulnerability) :

বিভিন্ন মহাদেশভিত্তিক নদীপাড়ের ক্ষয় প্রবণতাকে নিম্নলিখিত আলোচনায় উপস্থাপন করা হল।

☉ **এশিয়া (Asia)** : নদীপাড় ক্ষয়ের দিক থেকে পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশ হল এশিয়া। সমগ্র মহাদেশটিতে অসংখ্য নদনদী বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকলেও, এখানকার দক্ষিণ-পূর্বভাগেই নদীপাড় ক্ষয় সর্বাধিক হারে লক্ষ করা যায়। কারণ মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত এই অংশটি সক্রিয় একটি আর্দ্র অঞ্চল। তাই ঋতুভিত্তিক অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে, এখানকার নদীগুলিতে যেমন জলের জোগান যথেষ্ট বেড়ে যায়, একইভাবে ভূপৃষ্ঠ প্রবাহের সর্বাধিক মাত্রা নদীপাড় ভাঙনে অতি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

## ভূমিকম্প (Earthquake)

### A. সংজ্ঞা (Definition):-

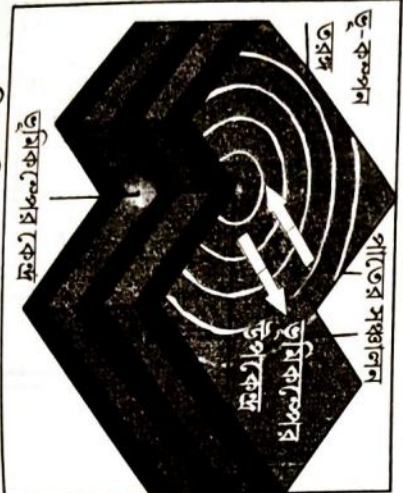
ভূপৃষ্ঠের ঘর্ষণ ক্রমে ভূমিকম্প বলে। ভূপৃষ্ঠে কোনো যুগ্ম কণমান অনুভূত হয়, আবার কখনো এতৎ ঝাঁকুরি সৃষ্টি হয়। এই কণমান বা ঝাঁকুরি মাথ কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। তবে এটি বিরতিসহ একাধিকবারও অনুভূত হতে পারে। ভূত্বক থেকে আকস্মিক শক্তি মুক্তির ফলে সৃষ্ট ভূকম্পনীয় তরঙ্গের ফলস্বরূপ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্প কার্যকরত বলতে কোনো একোকার একটি সময়কালে ভূমিকম্প সংঘটন সংঘা, ধরন ও আকারকে বোঝায়। বর্তমানে অক্যা ভূমিকম্প বলতে ভূকম্পনীয় তরঙ্গের উৎসকে (Source of seismic wave) বোঝানো হয়, ভূপৃষ্ঠের কণমানকে নয়। কারণ ভূপৃষ্ঠের কণমান ভূকম্পনীয় তরঙ্গেরই ফল। ভূমিকম্প প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয় প্রকারই হতে পারে।

সাধারণভাবে ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্টি হওয়া কোনো সোলোয়াল বা আলোড়নের ফলে পৃথিবীর কঠিন ভূত্বক কয়েক মুহূর্ত কিছু সময়ের জন্য ঘর্ষণ ক্রমে ঘটে বা আংশলিত হয়, একে ভূমিকম্প বলে। জ্যেষ্ঠাঙ্গিক A. N. Strahler ও A. H. Strahler -এর ভাষায় "An Earthquake is a vibration or oscillation of the surface of the earth caused by a transient disturbance of the elastic or gravitational equilibrium of the rocks at or beneath the surface." অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠের নিকটে বা ভূ-অভ্যন্তরে শিলাস্তরের স্থিতিশীলতা বা অভিকর্ষ ভারসাম্য কোনো কারণে বিঘ্নিত হলে ভূত্বকে যে কণমান বা সোলন সৃষ্টি হয়, তাকে ভূমিকম্প বলে।

### B. ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র (Focus and Epicentre of Earthquake):

ভূমিকম্পের কেন্দ্র (Earthquake Hypocentre): পৃথিবীর ভূগর্ভের অভ্যন্তরে যে স্থানে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, সেই স্থানকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র (focus or hypocentre) বলে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূ-অভ্যন্তরে 50 কিমি-র মধ্যে অবস্থান করে। তবে অধিকাংশ ভূমিকম্পের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে 16 কিমি-র মধ্যে থাকে।

আবার, 700 কিমি গভীরেও ভূমিকম্প কেন্দ্রের আবিষ্কার পাওয়া গেছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে তরঙ্গের আকারে কণমান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কেন্দ্র কোনো আনুভূতিক কেন্দ্র বা নিক্দ নয়। ভূকম্পের কেন্দ্রকে আলোকে ফোকাস (Focus)-ও বলে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র হল ভূগাঠনিক স্থান (tectonic location)। এটি ভূ-অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ার দরুন এখানে কয়কতি কম হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্রের গভীরতা অনুসারে ভূমিকম্পের কেন্দ্রকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।



চিত্র-ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র

(i) অগভীর ভূমিকম্প কেন্দ্র (Shallow foci Earthquake): অগভীর ভূমিকম্পের কেন্দ্র সাধারণত সুষ্পর্শ থেকে ভূ-অভ্যন্তরে 60 কিমি গভীরতার মধ্যে অবস্থান করে। এই অগভীর কেন্দ্রে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমিকম্প কেন্দ্রের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে।

(ii) মধ্যম গভীর ভূমিকম্প কেন্দ্র (Intermediate Foci Earthquake): অগভীর ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ভূ-অভ্যন্তরে প্রায় 300 কিমি গভীরতায় স্থানের মধ্যে মধ্যম গভীর ভূমিকম্পের কেন্দ্র অবস্থিত। এই কেন্দ্রের মধ্যে খুব কম ভূমিকম্পের কেন্দ্র লক্ষ্য করা গেছে।

(iii) গভীর ভূমিকম্প কেন্দ্র (Deep foci Earthquake): গভীর ভূমিকম্পের কেন্দ্রের গভীরতা ভূ-অভ্যন্তরের 300 কিমি থেকে প্রায় 700 কিমি-এর মধ্যে অবস্থান করেছে। এই কেন্দ্রে খুবই কম ভূমিকম্পের কেন্দ্র লক্ষ্য করা যায়।

ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (Earthquake Epicentre): ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্ট ভূমিকম্প কেন্দ্র বা ফোকাসের ঠিক মোজামুখি উপরে অর্থাৎ উল্লম্বদিকে সরাসরি কাছের ভূপৃষ্ঠ অবস্থিত স্থান বা বিন্দুকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বলে। অর্থাৎ কণমানের কেন্দ্র থেকে লম্বভাবে ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত স্থানকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (Epicentre of the Earthquake)। সুতরাং কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের মধ্যে উল্লম্ব দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণে এটি হল ক্ষুদ্রতম দূরত্ব। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে কণমানের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় এবং উপকেন্দ্র থেকে দূরত্ব হ্রাস হলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু, উপকেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে ভূপৃষ্ঠের বেশি পরিবর্তন হয়। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র থেকে তরঙ্গগুলি অনুভূমিকভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিগাম উপকেন্দ্র: ভূগোলিকের উপরে উপকেন্দ্রের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত স্থানটিকে ভূমিকম্পের প্রতিগাম উপকেন্দ্র বলে। অর্থাৎ ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে কণমানের তরঙ্গ সবদিক থেকে দূরত্ব হ্রাস হলে সেই স্থানটিকে ভূমিকম্পের প্রতিগাম উপকেন্দ্র বলে।

### C. ভূকম্পন তরঙ্গ (Seismic Wave):-

ভূমিকম্পের সময় যে শক্তি নির্গত হয় তা পাথরের মধ্যে কণমান সৃষ্টি করে। এই সময় যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তাকে ভূকম্পন তরঙ্গ বলে। এই তরঙ্গ পৃথিবীর অভ্যন্তরের বস্তুসমূহের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে এবং যে-কোনো স্থানে সিনেমাথোগ্র নামক যন্ত্রের সাহায্যে তা ধরাও যায়।

ভূকম্পনীয় তরঙ্গের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Seismic Waves):-  
ভূকম্পনীয় তরঙ্গকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (i) দের তরঙ্গ এবং (ii) পৃষ্ঠ তরঙ্গ।

(i) দের তরঙ্গ (Body Wave):- যে-সব তরঙ্গ ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূ-অভ্যন্তরের মধ্য দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় তাদের দের তরঙ্গ বলে। দের তরঙ্গকে ভূ-অভ্যন্তরস্থ তরঙ্গও বলা হয়। এই তরঙ্গের সাহায্যে ভূ-অভ্যন্তরের গঠন, স্থর-বিন্যাস এবং পদার্থের প্রকৃতি প্রভৃতি সংরক্ষণ জানা যায়। দের তরঙ্গ আবার দৃ-প্রকারের। যেমন- প্রাথমিক তরঙ্গ বা P তরঙ্গ এবং দ্বিতীয় তরঙ্গ বা S তরঙ্গ।

(ii) প্রাথমিক তরঙ্গ (Primary Wave):- যে সব তরঙ্গ ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূ-অভ্যন্তরের সমস্ত মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সর্বদিক দ্রুত গতিতে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে পৌঁছায়, তাদের প্রাথমিক তরঙ্গ বা P তরঙ্গ বলে।

ভূকম্পনীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য (Characteristics):-  
(1) P তরঙ্গ হল অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।

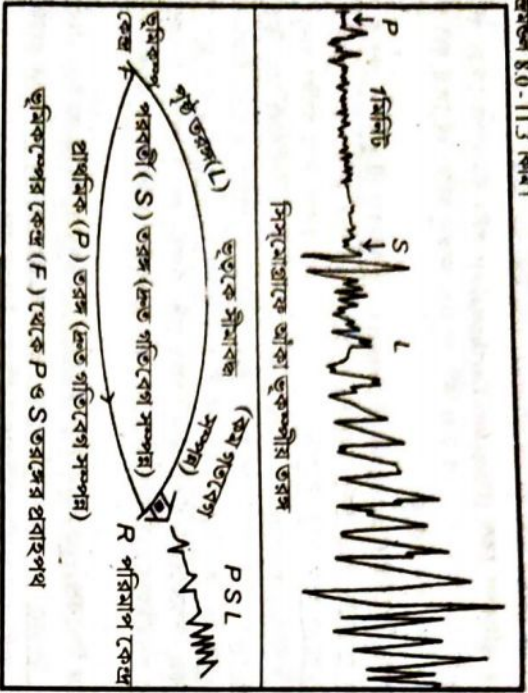
(১) এই তরঙ্গ যেকোনো প্রকৃতিতে হয়, মাধ্যমের কাণালি মেনিকেরই কাঁপতে থাকে এবং এর গতিবেগ সব-চেয়ে বেশি।

(২) এটি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় সঙ্গক বস্তুকার হয়। দিয়ে যেতে সক্ষম।

(৩) এটি সঞ্চারিত পৃথিবীর কেন্দ্রভাগের অংশ দিয়ে অংশ গ্রহণ করে যেতে পারে।

(৪) এটি সঞ্চারিত পৃথিবীর কেন্দ্রভাগের অংশ দিয়ে অংশ গ্রহণ করে যেতে পারে।

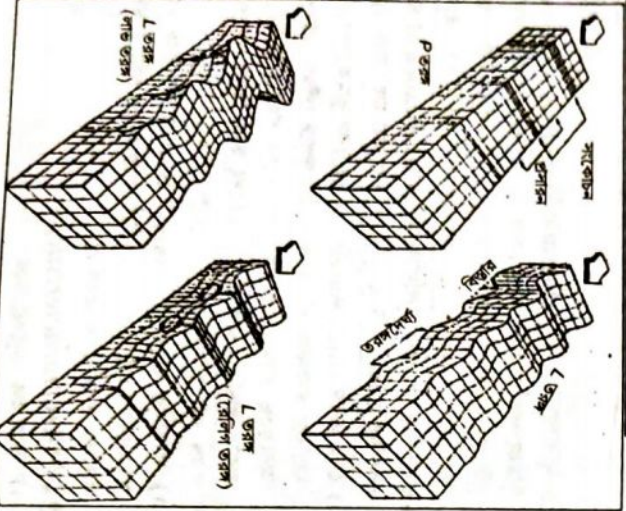
(৫) ভূত্বকে এর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ১.২৪-৬.৫ কিমি, গুরুত্বভাগে ৬.৪৭-১৩.৪ কিমি এবং কেন্দ্রভাগে ৪.০-১১.৩ কিমি।



### (b) সৌপ তরঙ্গ বা S তরঙ্গ (Secondary Wave):-

দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ যখন কঠিন বা সোফট তরঙ্গ বা ভূমিকম্পের উপরেই থেকে আভিজাতিকভাবে (transverse) অঙ্গসার হয়। এটি ভূকম্পনের যন্ত্রের তরঙ্গের পরে এসে পৌঁছায় বলে, একে দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ বলা হয়।

গাভ-সোফট প্রান্তিক তরঙ্গ আংশিক কয়, তরঙ্গ মাধ্যমে প্রান্তে পারে না, ভূত্বকে উপরে-নীচে আংশিকভাবে করে বা কাঁপনি দেয় বলে একে কাঁপনি তরঙ্গও (shake wave) বলা হয়। এ তরঙ্গ সঞ্চার মাধ্যমে আকৃতিগত পরিবর্তন (পীড়ন) খাটতে



সঞ্চারিত হয়। যেহেতু ভূমধ্যস্থ কঠিন পদার্থেরই নির্দিষ্ট আকৃতি সম্ভব, হেঁচক্য এ তরঙ্গ কঠিন ভূত্বকে ছাড়া অন্য কোথাও সঞ্চারিত হয় না। ২৯০০ কিমি গভীরতায় এ তরঙ্গ ছাড়া বিলুপ্ত হয় বলে অনুমান করা হয় ২,৯০০ কিমি-এর ঠিক নিচে ভূগর্ভে বস্তু গলিত অবস্থায় আছে। সঞ্চার মাধ্যমের পীড়ন ঘারা এ তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় বলে, এ তরঙ্গকে অনেক পীড়ন তরঙ্গ (shear wave) বলে থাকেন। আংশিক তরঙ্গের চেয়ে S তরঙ্গের গতিবেগ কম।

(ii) পৃষ্ঠ তরঙ্গ বা পৃষ্ঠ তরঙ্গ (Surface Wave or L-wave):- পৃষ্ঠ তরঙ্গ ভূমিকম্পের কেন্দ্রে থেকে দ্রোণা উপরে উপরেই পৌঁছায় এবং যেখান থেকে ভূত্বকের উপরের অংশ দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো ঘেঁষে তরঙ্গ অপেক্ষা কম গতিবেগে সঞ্চারিত। নিম্ন কম্পাঙ্ক পৃষ্ঠ তরঙ্গের গতিবেগে P বা S তরঙ্গ অপেক্ষা কম এবং এ তরঙ্গের গতিবেগ সাধারণত ভূমিকম্পের কেন্দ্রে নির্ণয় করা হয়। ভূকম্পনে যখন পৃষ্ঠতরঙ্গের উপস্থিতির সময়কালের ওপর ভিত্তি করে ভূমিকম্পের কেন্দ্রে নির্ণয় করা হয়। পৃষ্ঠ তরঙ্গ দুই ধরনের। যথা- গাভ তরঙ্গ (love waves) ও রেলিগ তরঙ্গ (rayleigh waves)।

(iii) গাভ তরঙ্গ (Love Waves):- ভূমিকম্পের পৃষ্ঠ তরঙ্গ স্থিতিস্থাপক ভূপৃষ্ঠকে ছাপিয়ে একপাশে সংকুচিত করে পর মুহুর্তে আবার বিপরীত পাশে চাপ সৃষ্টি করে সংকুচিত করে, তখন বিপরীত গাভানের সৃষ্টি হয়। যে পাশে সংকোচন ঘটে তার বিপরীত পাশে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এভাবে পৃষ্ঠ তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে যে অনুভূমিক বিপরীত পীড়নের সৃষ্টি করে, তাকে গাভ তরঙ্গ বলে। ১৯১১ সালে এই এইট লভ (A. E. H. Love) গাণিতিকভাবে এ তরঙ্গের বিধয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন বলে, তার নামানুসারে এ তরঙ্গকে গাভ তরঙ্গ বলে। গাভ তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠকে অনুভূমিক ভাবে স্থানচ্যুত করে থাকে।

(b) রেলিগ তরঙ্গ (Rayleigh Waves):- রেলিগ তরঙ্গ এক ধরনের পৃষ্ঠ তরঙ্গ, একে ভূমি গভাণো তরঙ্গও বলা হয়। রেলিগতরঙ্গ উপরভাগে পঞ্চদশমুখী উপবৃত্তকার গতিতে অঙ্গসার হয়। এ তরঙ্গের গতিবেগে গাভ তরঙ্গ অপেক্ষা কম। এটি স্ফল পৃষ্ঠের উপরের তরঙ্গের মতো নয়, তরঙ্গ তুলে অঙ্গসার হয়। ১৮৪৫ সালে লর্ড রেলিগ এ তরঙ্গের আউটলেট ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। রেলিগ ও গাভ উভয় প্রকার তরঙ্গের ফলে ভূপৃষ্ঠের পদার্থসমূহ নিক্রমণী হয়।

### D. ভূকম্পন তীব্রতা (Intensity of Earthquake/Seismic Intensity):-

ভূকম্পনের সময় ভূমির অংশের মাধ্যমে ভূকম্পন তীব্রতা বলে। ইতালির ভূতত্ত্ববিদ জি. মার্কালি (Giuseppe Mercalli) ১৯০৫ সালে ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপের জন্য একটি মাত্রাঙ্ক (Scale) প্রবর্তন করেন। এটি মার্কালি তীব্রতা স্কেল (মাত্রাঙ্ক) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে তিনি এটির পরিমার্জিত রূপ প্রকাশ করেন। মার্কালির পরিমার্জিত স্কেলে ১ থেকে ১২ টি পর্যন্ত সংখ্যা রাখা ভূমিকম্পের মাত্রা প্রকাশ করা হয়।

৪. ভূমিকম্পের উন্নতি পরিমাপের পরিমাপিত মানকি স্কেল-

1. র্বেয় মার (Nagibubek)'	কেবলমাত্র যাত্র ধরা পড়ে।
2. রুইল (Ruedel)	সুস্থানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির সুখতে পারে। কেবলমাত্র বহু ধোনে।
3. রুইল (Ruedel)	কোন কাঠনের স্রিণাতের পার্শ্বক ঘটে। কাঁচামো খোঁচ ঘটি য়ুল ওঠে।
4. ম্যারি (Macdonald)	ঘরের ভিতরে কাঁকুনি অনুভব করা যায়। কেবলমাত্র কেবলমাত্র ঘুমন্ত মানুষ স্কেলে উঠতে পারে। কেবলমাত্র বহু সুখতে থাকে। ভারী গাডি দলনানে আখাত করেহে বলে অনুভব হয়। জানলা ও বাসন-কোশন ঝনঝন শব্দ করে। কাঁচামো গাডি য়োলে।
5. রুইল শক্তিমানী (Richer sctance)	অধিকাংশ মানুষ সুখতে পারে; অনেক স্কেলে ওঠে। মেয়ালের আতরণ খসে পড়ে। বাসনপত্র ও জানলা ভেঙে যায়। মেয়াল ঘড়ির সেন্সক থেকে যায়।
6. শক্তিমানী (Stancy)	সবকলেই সুখতে পারে, অনেক ভয় পেয়ে যায়। টিমনি পড়ে যায়। অপববববহে নাচে।
7. সুব শক্তিমানী (Very Stancy)	সিপন সকেতে; অধিকাংশ মানুষ বাহিরে ছুটে যায়। দুর্কল স্থাপত্যগুলো আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোটামুটি গাভাতে শুরু করে।
8. ধরোস্থক (Destructive)	সাধারণ সতর্কসকেতে; সবকলেই বাহিরে ছুটেতে থাকে। দুর্কল স্থাপত্যগুলো গ্রায় ধরো হয়ে যায়; শক্তিমানী কাঁচামোগুলো আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারী অপবববপহে উঠে পড়ে।
9. ধরোস্থক (Destructive)	নিয়ন্ত্রণহীন আতঙ্ক। দুর্কল স্থাপনা সম্পূর্ণ ধরো হয়ে যায়। বিশেষভাবে নস্বাসকত কাঁচামোর সামান্য ক্ষতি হয়। ভিত্তি দুর্কল হয়। ভূগর্ভস্থ পাইপ কাঠিন স্কেটে যায়। উপরে কাঁচিন স্টি হয়।
10. বিশেষকর (Destructive)	নিয়ন্ত্রণহীন আতঙ্ক। কেবলমাত্র ভালো দলনান্যুলো টিকে থাকে। ভিত্তি ধরো হয়। কোন কাঠিন স্কেতে যায়। ভূমি মারাত্মকভাবে স্কেটে যায়।
11. মধ্যবিশেষকর (Very destructiveness)	নিয়ন্ত্রণহীন আতঙ্ক। পাথরের নির্মিত কাঠিন্য অবকাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে। উপরে বিস্তীর্ণ ফাটলের সৃষ্টি হয়। বড় ধরনের ভূমিধসন হয়।
12. বিশেষকর (Overdestructive)	নিয়ন্ত্রণহীন মধ্যআতঙ্ক। সবকিছু ধরো হয়ে যায়। ভূমিতে ভরপ দেখা যায় সবকিছু শূন্যে উৎক্ষেপ হয়।

### F. ভূকম্পন মাত্রা (Earthquake Magnitude):-

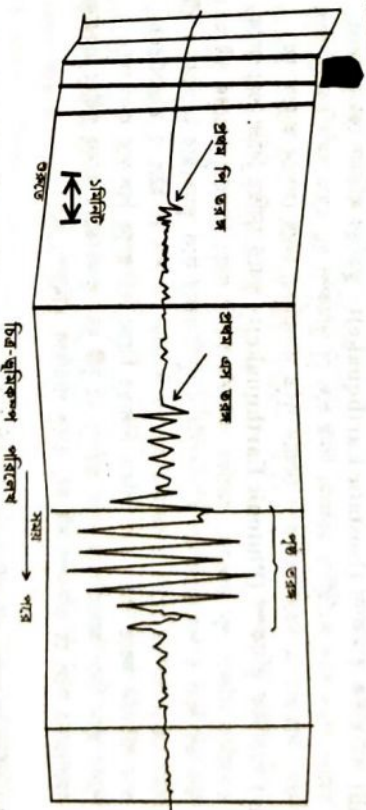
ভূকম্পনের সময় কতটা শক্তি নিগত হয় তা হিসাব করে বের করা যায়। এ শক্তির পরিমাপকে ভূকম্পন মাত্রা বলে। ভূকম্পনের পরিমাণ থেকে এটি বের করা হয়। পৃথক পৃথক এর ভূগর্ভস্থ ভরনের ভূকম্পন মান নির্ধারণের জন্য জি. রিখটার সসীকরণ ব্যবহৃত হয়। 1935 সালে আমেরিকান ভূকম্পন বিশ বিশারিখটার (Charles Richter) ভূকম্পন মাত্রার যে ক্রম প্রস্তাব করেন তা রিখটার স্কেল

নামে পরিচিত। রিখটার মাত্রাক্রম সাধারণত ভূকম্পনের মাত্রা বোঝাতে আঙ্কল ব্যবহৃত হয়।

এ স্কেল লগারিথমীয় অর্থাৎ এটিতে মাত্রা-সংখ্যা তার পূর্ববর্তী মাত্রা-সংখ্যার শক্তি দশগুণ শক্তির মতক 10 থেকে 10 পর্যন্ত 10 টি মাত্রাসূচক এই স্কেলে আছে। A. S. মাত্রার বেশি যতই সে ভূকম্পন উপরে ভারী পরিবর্তন ও ক্ষতি ঘটে থাকে। সাধারণত প্রায়ঃকর ভূকম্পনাতোর কম্পনমাত্রা 7-এর বেশি হয়ে থাকে। ভূকম্পনের সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমির স্থানের মাত্রা (  $\mu =$  অভিকর্ষজনিত ভ্রুণ) যাদের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় এবং অভিকর্ষজাত ভ্রুণের সমাধান রূপে প্রকাশ করা হয়। আজ পর্যন্ত যেসব ভূকম্পন নির্মাণ করা গেছে, তেতে সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল 8.9। একটি বিশেষ ধরনের সিসমোগ্রামের শূন্য থেকে অবস্থিতক রিজেক্টর সর্বোচ্চ সিগনালি কম্পনমাত্রা 10 গুণ হিসাবে করা হয়। যেসব-রিখটার স্কেলে একটি ভূমিকম্পের মাত্রা 5.0 এর অধিক হলে এটি 4.0 মাত্রার ভূমিকম্পের কাঁচামির অনুভূমিক বিস্তৃতি অপেক্ষা 10 গুণ বেশি বিস্তৃত।

### F. ভূকম্পন পরিলেখ (Seismogram):-

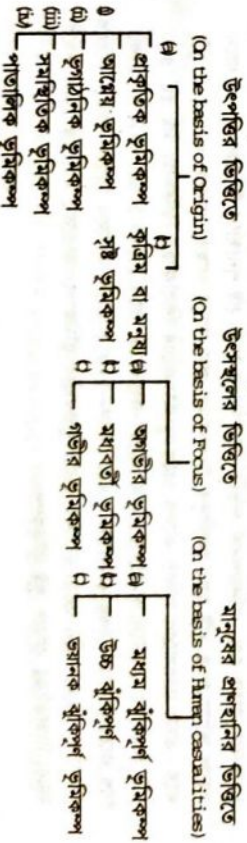
ভূকম্পন তরঙ্গ রেকর্ড করার যন্ত্রে গ্রাফপেনে যে ভূকম্পন তরঙ্গ ধরা পড়ে তাকে ভূকম্পন পরিলেখ বলে। যেমতো ভূকম্পন পরিলেখতে তিন গ্রাফ তরঙ্গ দেখা যায়। যে গ্রাফটি সর্বপ্রথম ধরা পড়ে তা সর্বাধিক হুতাতির P তরঙ্গ, তার পরেরটি S তরঙ্গ এবং সর্বশেষটি অপেক্ষাকৃত লক্ষণাত্মিক L তরঙ্গ।



### G. ভূমিকম্পের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Earthquake):-

ভূমিকম্পের শ্রেণীবিভাগ

(Classification of Earthquake)



## ভূমিকম্প (Earthquake)

চোখে দেখা যায় না এমন কোনো কারণে ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ মৃদু অথবা খুব জোরে কেঁপে ওঠে\* তখন তাকে ভূমিকম্প (Earthquake) বলে। ঝাঁকুনি বা কম্পন খুব আস্তে হলে অনেক সময় তা বোঝা যায় না, কিন্তু ঝাঁকুনি যদি খুব জোরে ও অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়, তবে ভূপৃষ্ঠে ধ্বংসস্তূপের সৃষ্টি হয়।

ভূমিকম্প সমান মাত্রায় সব জায়গায় হয় না। কোথাও তীব্র কোথাও মৃদু। এই কম্পন মাপা হয় ভূকম্পলিখ (Seismograph) যন্ত্রের সাহায্যে। ভূবিজ্ঞানী মাসেলি ভূকম্পনের তীব্রতা মাপার স্কেল আবিষ্কার করেছিলেন। এই স্কেল অনুসারে তীব্রতা 1 থেকে 12 পর্যন্ত ধরা হয়।

অপর এক বিজ্ঞানী রিক্টরও ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার একটি স্কেল নির্ণয় করেছিলেন। এই স্কেল অনুসারে 1 থেকে 10 পর্যন্ত তীব্রতা মাপা হয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প হয়েছে রিক্টর স্কেল অনুসারে তাদের তীব্রতার মান গড়ে 8.6। গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, কম্পনের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 16 কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করে।

ভূমিকম্পের কারণ :

নানা কারণে ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে, যেমন—

1) ভূবিজ্ঞানীদের মতে ভূত্বক কতগুলি চলমান 'প্লেট' (plate) বা পাতের সমন্বয়ে তৈরি। চলমান পাতগুলির মধ্যে যখন দুটো পাত পরস্পরের মুখোমুখি হয় তখন ওই সংযোগরেখা বরাবর শিলাচ্যুতি ঘটে। এর ফলে মাটি কেঁপে ওঠে। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলি পাতসীমা বরাবর অবস্থিত।

\* কোনো বড়ো গাড়ি রাস্তা দিয়ে গেলে কিংবা কোনো উঁচু নীচু জায়গায় পড়ে ঝাঁকুনি খেলে তাতেও চারপাশের মাটি কেঁপে উঠতে পারে। কিন্তু এই কেঁপে ওঠা ভূমিকম্প নয়, কারণ ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে কম্পন ভূত্বকের শিলাস্তর অবলম্বন করে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত যাবে এবং তা সিসমোগ্রাফে অনুভূত হবে। কিন্তু গাড়ি যাওয়ার ফলে যে-কম্পন তা ভূপৃষ্ঠের শুধুমাত্র মাটির স্তরে অনুভূত হয় এবং অল্প একটু দূরে গিয়েই তা মিলিয়ে যায়।



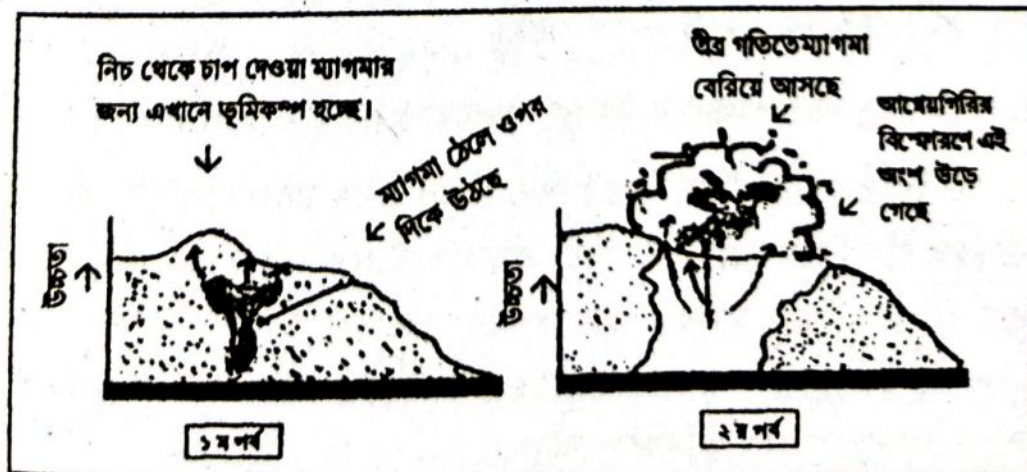
২) আবার চলমান পাতগুলি পরস্পরের থেকে দূরে সরে গেলে ভূগর্ভে চাপের হেরফের হয়, যা ভূমিকম্পের একটি কারণ।

৩) নবীন ভঙ্গিলা পার্বত্য অঞ্চলের গঠনকার্য এখনও চলছে (যেমন - হিমালয়)। ওই অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে এখনও স্থিতিস্থাপকতা (stability) আসেনি। ফলে কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ার সময় মাটি কেঁপে ওঠে। এই কারণে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়।



চিত্র ২১ : প্লেটের অবস্থান। দুটো পাত যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তখন ভূমিকম্প হয়।

৪) ভূগর্ভে কোনো কারণে শিলাচ্যুতি ঘটলে বা ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান চ্যুতির ফলে সরে গেলে (displacement) ভূগর্ভে চাপের স্থিতিস্থাপকতা আর থাকে না। তখন চ্যুতি তল বরাবর চাপের মোচন হয় বলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।



চিত্র ২২ : অগ্ন্যুৎপাতের জন্য অনেক সময় ভূমিকম্প হয়।

১) আগ্নেয়গিরি থেকে প্রবলবেগে অগ্ন্যুৎপাতের সময় আশেপাশের ব্যাপক এলাকা কেঁপে ওঠে ও প্রবল ভূমিকম্প হয়, যেমনটি ঘটেছিল ক্রাকাতাও আগ্নেয় দ্বীপে।

১৮৮৩ সালে মে মাসে ওই দ্বীপে পার্বোওয়াতান জ্বালামুখ সক্রিয় হয়ে ওঠে আর তার সঙ্গে সঙ্গে পাশের জ্বালামুখ দানামও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ২ বার অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। এর মধ্যে ২৬ আগস্ট প্রায় প্রত্যেক ১০ মিনিট অন্তর উদ্‌গিরণ ঘটে থাকে আর বিরাট ক্রাকাতাও দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং সেখানে সমুদ্রের সৃষ্টি হয়। এই বিস্ফোরণের শব্দ এত তীব্র হয়েছিল যে ওই দ্বীপ থেকে প্রায় ৫০০০ কি.মি. দূরের অস্ট্রেলিয়াতেও তা শোনা গিয়েছিল এবং ৮০ কি.মি. উঁচু আগ্নেয় মেঘ সৃষ্টি হয়। এই বিস্ফোরণে ৩৬মি. উঁচু সুনামির উৎপত্তি হয়, যার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জাভা ও সুমাত্রার ৩৬,০০০ মানুষ জলমগ্ন হয়।

৬) প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন পার্বত্য অঞ্চলে ধস নামলে বা হিমবাহের কিছু অংশ হিমালয় সম্প্রপাতরূপে (avalanche) খসে পড়লে বা খনিজ পদার্থ তোলার সময়ে খনিতে ধস নামলে আশেপাশের এলাকার মাটি কেঁপে ওঠে।

৭) সমুদ্রগর্ভে অবক্ষিপণের পার্থক্য হেতু ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

৪) বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি দেশ ভূগর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছে। ফলে ভূগর্ভের শিলাচ্যুতি ঘটেছে ও ভূপৃষ্ঠের স্থিতিস্থাপকতা বিনষ্ট হয়ে ভূকম্পের সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যখন ভূপৃষ্ঠ থেকে বেশ কিছুটা নিচে বোমা ফাটিয়ে তার (বোমার) শক্তি পরীক্ষা করা হয়, তখনও ব্যাপক এলাকা জুড়ে ভূমিকম্প হতে পারে। এ ছাড়া পাহাড়ে রাস্তা তৈরির জন্য ডিনামাইট চার্জ করা হলে আশেপাশের এলাকায় ভূমিকম্প হতে পারে। এ ধরনের ভূমিকম্পে ধসের সম্ভাবনা থাকে।

৯) কখনো-কখনো ক্ষুদ্রমণ্ডল থেকে তাপপ্রবাহ পরিচলন আকারে ওপরে উঠে এসে ভূপৃষ্ঠে ধাক্কা দেয়। সেই সময় মাটি কেঁপে ওঠে।

১০) ধূমকেতু বা বিশালাকার উল্কার সংঘাতে ভূকম্প হতে পারে।

১১) জলাধার তৈরির ফলে নীচের শিলাস্তরের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। এর ফলে ওপরের শিলাস্তর বসে গিয়ে ভূমিকম্প ঘটায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাতে গিয়ে মানুষও পরোক্ষভাবে ভূমিকম্প ঘটায়। যেমন ১৯৬৭ সালে মহারাষ্ট্রের কয়নার ভূমিকম্প। কয়না জলাধারের জলরাশি নীচের শিলাস্তরের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলে তা স্থানচ্যুত হয়ে ভূমিকম্প ঘটায়।

## ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল :

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিতে হয়।

১) হিমালয়, আন্ডস, রকি, অ্যান্ডিজ ইত্যাদি নবীন ভূগোল পর্বতগুলির গঠন কার্য এখনও চলছে। ফলে এইসব স্থানে বেশি ভূমিকম্প হয়।

২) খাড়া উপকূলভাগ (Steep Coast) : জাপান, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যান্ডের খাড়া উপকূলভাগের ভূমি সুস্থিত নয়, ফলে এখানে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়।

৩) আগ্নেয়গিরি অঞ্চল (Volcanic Region) : যেসব স্থানে আগ্নেয়গিরি আছে সেখানে অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীতে দুটি ভূমিকম্প বলয় আছে।

(i) একটি প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টিত করে অবস্থান করছে।

(ii) অপরটি ভূমধ্যসাগরের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম উভয়দিকে প্রসারিত হয়েছে। প্রথমটির নাম 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা বলয়' (Fiery Ring of the Pacific) এবং দ্বিতীয়টির নাম 'ভূমধ্য-পার্বত্য ভূমিকম্প বলয়' (Mid-World Mountain Belt)।

## গুজরাটের ভূজ ভূমিকম্প

২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের গুজরাট রাজ্যের ভূজ-এ রাত ৩ টে ১৬ মিনিট জি.এম. টি. সময়ে ৭.৬ রিখটার মাত্রা এক ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের একমাস পরে ভারত সরকারের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, এই ভূমিকম্প মৃতের সংখ্যা ছিল ১৯,৭২৭ এবং আহতের সংখ্যা ১,৬৬,০০০। এ ছাড়া ৬,০০,০০০ লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে ৩,৪৮,০০০ বাড়ি ধ্বংস হয় এবং মোট ৩৭.৮ মিলিয়ন লোকের মধ্যে ১৫.৯ মিলিয়ন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূজ ভূমিকম্পে ২০ হাজারেরও বেশি গবাদি পশু মরা যায় এবং সরকারি হিসেব অনুযায়ী মোট ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়। ১৮১৯ সালে ভয়াবহ গুজরাট ভূমিকম্পে যেসব ঐতিহাসিক স্থাপত্য ভূমিকম্পের প্রকোপ থেকে বেঁচে যায় ২০০১ সালের ভূমিকম্পে তাদের কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এক সমীক্ষায় জানা যায় :— ওই অঞ্চলের ভূমিতে কতকগুলি আঁ-এশেলোঁজাতীয় ফাটল দেখা গেছে, কিন্তু কোনো চ্যুতি ভূগুত সৃষ্টি হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূপৃষ্ঠের নীচে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ২ কিলোমিটার লম্বা একটি চ্যুতির কারণেই ভূপৃষ্ঠে ফাটল দেখা যায়। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ কয়েকজন উদকবিজ্ঞানী লক্ষ করেন, কয়েকশো বছর ধরে শুষ্ক থাকা কয়েকটি নদীতে প্রবাহ শুরু হয়েছে। এই অবস্থা লিকুইফ্যাকশনের (Liquefaction) কারণে হয়েছে বলে মনে করা হয়। (পার্থ বসু, ২০০৮, প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ভূমিরূপ বিদ্যা)

বিশেষত তা আগ্নেয় বা পরিবর্তিত শিলা দ্বারা তৈরি করা হলে বাড়িগুলি শক্তপোক্ত হয় ও তা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। GPS পদ্ধতির মাধ্যমে অতি সহজেই ভূ-স্তরের পরিবর্তনের অধ্যয়ন এবং পাতগুলির ক্রমচলনের ফলে তার উপরিস্থিত ভূ-স্তরের উপরিভাগের পরিবর্তনের প্রকৃতি অধ্যয়ন করা যায় এবং ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সেখানকার মানুষদের সতর্ক করে দেওয়া যায়।

### 3. ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা (Rehabilitation Measures):-

ভূমিকম্প ঘটে যাওয়ার পর ওই অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়। দক্ষ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, NGO এবং সমাজসেবী সংস্থা এই পুনর্বাসনের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, ওষুধ প্রভৃতির ব্যবস্থা। এছাড়া এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে যা করণীয় তা হল-

- ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাগুলির ম্যাপ প্রস্তুত করে সেখানকার মানুষদের ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার মানুষদের ঘরবাড়ি তৈরি করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো এবং বাড়ি নির্মাণের উপযোগী উপকরণের যোগান দেওয়া।
- ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আগে থেকেই রিলিফের ব্যবস্থা করা।

#### ● ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যক্তিস্তরে করণীয় দিক সমূহ-

- ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় বাড়িঘর তৈরি করার সময় কোনো সরকারী দপ্তর বা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে জানতে হবে যে কোন্ কোন্ উপকরণের দ্বারা বাড়ি করতে হবে।
- বাড়িটি যাতে সহজে ভেঙে না পড়ে তার জন্য উপযুক্ত বস্তু দিয়ে বাড়ির বেসমেন্ট তৈরি করতে হবে।
- ভূমিকম্প হওয়ার পূর্বে বাড়ির বিভিন্ন জিনিস সঠিকভাবে রাখতে হবে। যেমন ভারী বস্তুগুলিকে ঝুলিয়ে না রেখে আলমারির নিচের তাকে রাখতে হবে। কাঁচের জিনিসগুলোকে আলমারিতে বন্ধ করে রাখতে হবে।
- বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা খুব সঠিকভাবে হওয়া দরকার।
- ভূমিকম্পের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনো ফাঁকা স্থানে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তা সম্ভব না হলে কোনো শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে মাথায় বালিশ চাপা দিয়ে রাখতে হবে।

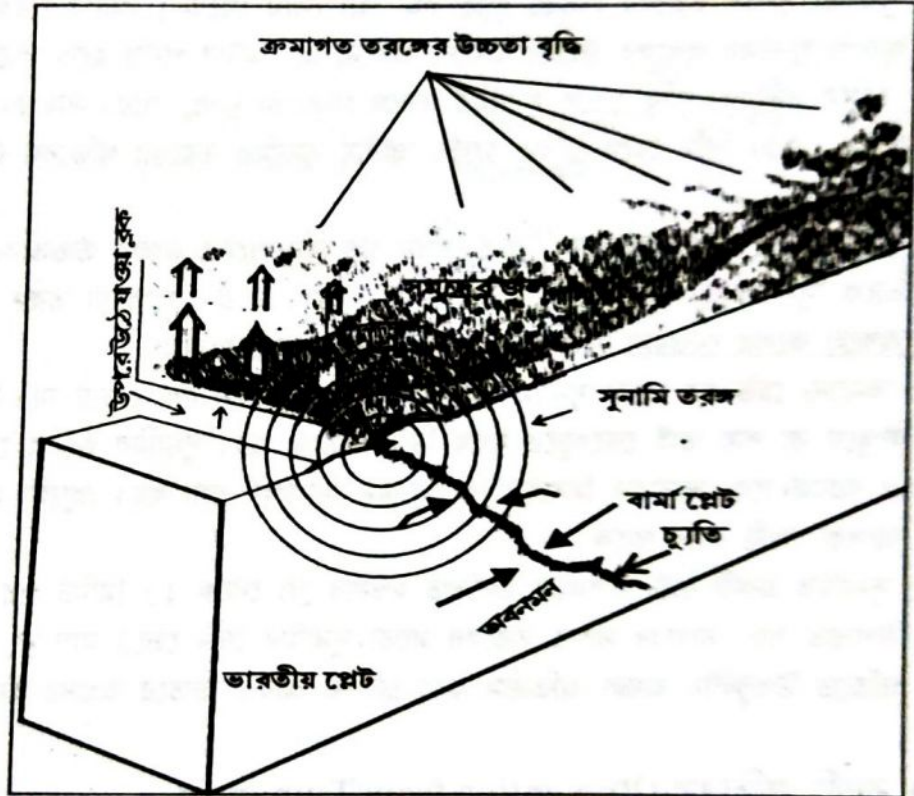
#### M. সুনামি (Tsunami):-

সুনামি একটি জাপানি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ tsu = পোতাশ্রয় + nami = তরঙ্গ। অর্থাৎ সুনামির শাব্দিক অর্থ পোতাশ্রয় তরঙ্গ। ভূকম্প বা ভূগাঠনিক কারণে সৃষ্টি তীব্র গতিসম্পন্ন ও ধ্বংসাত্মক সাগর তরঙ্গকে বোঝানোর জন্য সুনামি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র থেকে এক বা একাধিক সুনামি তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাগরের সাধারণ ঢেউ-এর সাথে সুনামির পার্থক্য হচ্ছে, সুনামির ঢেউ ভেঙে যায় না, ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য অস্বাভাবিক প্রায় 100 কিমি-এর বেশি, গতিবেগ প্রচণ্ড 500-1000 কিমি, উচ্চতা গভীর সমুদ্রে গড়ে 30 সেমি থেকে 1 মিটার পর্যন্ত। উপকূলীয় অঞ্চলে জলের গভীরতা কমে যাওয়ার সাথে সাথে ঢেউ-এর গতি কমে কিন্তু উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং গড়ে 10-15 মিটার উঁচু ঢেউ খাড়া দেওয়ালের মতো প্রচণ্ড শক্তি ও গতিতে সবকিছু

ধ্বংস করে সম্মুখে অগ্রসর হয়। সমুদ্রের নিচে ভূগাঠনিক কারণে সুনামি সৃষ্টি হয় এবং গভীর সমুদ্রে অবস্থানকালে এর উপস্থিতি বোঝা যায় না বলে সতর্কীকরণে খুব বেশি সময় পাওয়া যায় না।

### ● সুনামির উৎপত্তি ও কারণ (Causes & Origin of Tsunami):-

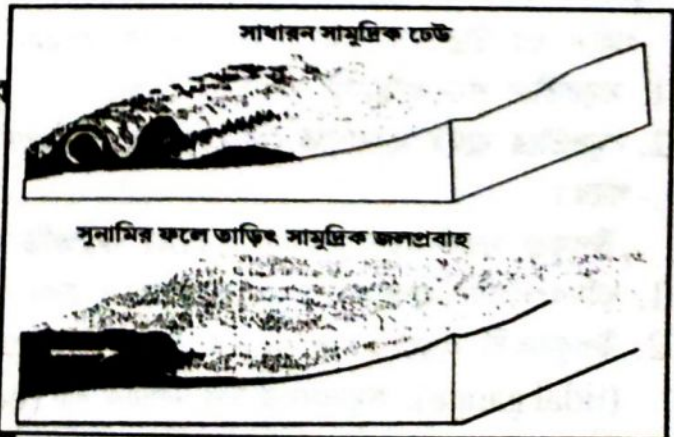
সমুদ্রতলে উচ্চ মাত্রার (magnitude) ভূমিকম্প (কমপক্ষে রিখটার স্কেলে 7.5 মাত্রা) হলে সুনামি সৃষ্টি হয়। বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভয়ঙ্কর সুনামি সৃষ্টি হয়। যেমন- ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে 1883 সালে 36 মিটার উঁচু সুনামি সৃষ্টি হয়েছিল। উপকূলীয় অঞ্চল বা মহীসোপান বা মহীঢালে ব্যাপক ভূপাত হলে সমুদ্রের জলসমতা নষ্ট হয়। দ্রুত সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের সমতা রক্ষার জন্য তখন জলরাশিতে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। দুটি অভিসারী প্লেট সীমানায় সংকোচন গতির ফলে একটি প্লেটের নিচে অপরটি চাপা পড়ে যায় অথবা একটি অপরটির উপরে ওঠে যায়। ফলে প্লেট সীমানায় সমুদ্রের তলদেশে ফাটলের সৃষ্টি হয়ে সমুদ্র তলদেশের সমতা



চিত্র - সুনামি তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

বিনষ্ট হয়ে সুনামির সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের নিচের ভূভাগে চ্যুতির সৃষ্টি হলে চ্যুতির এক অংশ উপরে ওঠে যায় এবং অপর অংশ নিচে নেমে সমুদ্রের জলের সমতা নষ্ট করে। ফলে সুনামির উৎপত্তি হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 2004 সালের 26 ডিসেম্বর ইন্দো-অস্ট্রেলিয় প্লেট মায়ানমার প্লেটের (এশিয়া প্লেটের অংশ) নিচে ঢুকে যাওয়ার



চিত্র - সুনামি ও সমুদ্র ঢেউ-এর বৈশিষ্ট্য

ফলে 2400 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি চ্যুতির প্রায় অর্ধেক বা প্রায় 1200 কিমি স্থান 10 থেকে 12 মিটার পর্যন্ত হঠাৎ উপরে ওঠে যায়। এর ফলে 9.3 মাত্রার ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় এবং 200 ট্রিলিয়ন টন জল স্থানচ্যুত হয়ে সুনামির সৃষ্টি করে, যা প্রাথমিকভাবে প্রায় 800 কিমি গতিতে অগ্রসর হয়।

### ● সুনামি তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of tsunami waves):

1. সুনামি হচ্ছে এক ধরনের উচ্চ শক্তিসম্পন্ন সামুদ্রিক তরঙ্গ, যা বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারলেও সমুদ্রের নিচে ভূমিকম্পই প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত।
2. উৎপত্তির পর সুনামি তরঙ্গ কোনোটি গভীর সমুদ্রের দিকে আবার কোনোটি উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়। তরঙ্গের গতিবেগ সমুদ্রের জলের গভীরতার ওপর নির্ভর করে।
3. গভীর সমুদ্রে সুনামি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 100 কিমি-এর অধিক হলেও যতোই উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, ততোই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কমতে থাকে।
4. দূরবর্তী সুনামি তরঙ্গের উচ্চতা খুবই কম- 30 সেমি থেকে 1 মিটার পর্যন্ত হলেও উপকূলীয় অঞ্চলে সুনামির তরঙ্গের উচ্চতা কখনো কখনো 40 মিটার পর্যন্ত হতে পারে।
5. জলের গভীরতা বৃদ্ধি পেলে সুনামির তরঙ্গে গতিবেগ বৃদ্ধি, পায়। সাধারণত দূরবর্তী সুনামি 500 থেকে 1,000 কিমি বেগে ধাবিত হলেও স্থানীয় সুনামির তরঙ্গের গতিবেগ উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক কম।
6. সমুদ্র তীরে সুনামির জলের উচ্চতা যখন গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের উচ্চতার উপরে ওঠে, তখন তাকে 'সুনামি রান-আপ' (Tsunamirun-up) বলে। এ রান-আপ বা তরঙ্গ ব্যাপকতা উপকূলীয় অঞ্চলে জলের দেওয়াল সৃষ্টি করে এবং আকস্মিক বন্যার কারণ।
7. অন্যান্য ঢেউ-এর মতো সুনামি ঢেউ-এর অগ্রবর্তী লাইন ভেঙে যায় না। বিপুল শক্তিশালী জলরাশি সম্মুখে যা পায় তাই ভেঙেচুরে সাথে নিয়ে অগ্রসর হয়। সুনামির জলের স্রোতের সাথে প্রবাহমান এ আবর্জনাকে 'ভাসমান মিসাইল' বা 'সুনামি মিসাইল' বলা হয়। এগুলো মানুষের জানমানবের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে।
8. সুনামির একটি ঢেউ উপকূলে উপস্থিত হওয়ার 20 থেকে 40 মিনিট পর দ্বিতীয় ঢেউ এসে উপস্থিত হয়। সাধারণ সাগর তরঙ্গের মতো সুনামির ঢেউ ভেঙে যায় না বরং, এটি পূর্ণশক্তি ও গতিতে উপকূলীয় অঞ্চল অতিক্রম করে দেশের আরও ভিতরে অগ্রসর হয়।

### ● সুনামি প্রতিরোধ (Prevention from Tsunami):-

সুনামির ভয়াবহতা থেকে পৃথিবী ও মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা সম্ভব নয়। তবে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণে এর তীব্রতাকে কমানো যেতে পারে। যেমন-

1. সমুদ্রতীরে শক্ত প্রতিরোধ দেওয়ালে তোলা।
2. সমুদ্রতীরে যথেষ্ট ম্যানগ্রোভ (যা নোনা জলে বাঁচতে পারে) জাতীয় গাছ লাগানোর কথা ভাবা যেতে পারে।

উপযুক্ত সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় সুনামির ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। এই ব্যবস্থারূপে-

1. ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের সিসমোগ্রাফ যন্ত্রকে উন্নত করা ;
2. উপকূলবর্তী অঞ্চলের দেশগুলির সমুদ্রের ঢেউ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য জোয়ার মাপক যন্ত্র (tidal gauge), সমুদ্রজলের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র (bottom pressure sensor) ইত্যাদির পরিষেবা বৃদ্ধি করা ;

3. সর্বোপরি বিভিন্ন দেশের সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্রের (National Tsunami Early Warning Centre) মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদির উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিশ্বে সর্বাধুনিক এ জাতীয় সতর্কবার্তা কেন্দ্রটি রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের হনলুলুতে।

### ভূ-আলোড়ন ও ভূমিকম্পের তুলনা

(Difference between Earth Movement and Earthquake):

ভিত্তি	ভূ-আলোড়ন	ভূমিকম্প
1. প্রকৃতি	এটি ধীরে বা দ্রুত পরিবর্তনকারী অন্তর্জাত শক্তি।	এটি অতি দ্রুত পরিবর্তনকারী অন্তর্জাত শক্তি।
2. পরিমাপ যোগ্যতা-	এতই ক্ষীণগতিসম্পন্ন যে এটি পরিমাপ অযোগ্য। তবে এর প্রভাবে ভূমিরূপের পরিবর্তন বোঝা যায়।	এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দ্বারা পরিমাপযোগ্য। যথা- সিসমোগ্রাফ দ্বারা ভূমিকম্প মাপা হয়।
3. স্থায়িত্ব-	ভূত্বক সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজও একইভাবে কার্যকরী আছে।	এর প্রভাব খুবই ক্ষণস্থায়ী। এটি সবসময় ক্রিয়াশীল থাকে না।
4. ব্যাপ্তি-	এটি আঞ্চলিক বা সারা বিশ্বব্যাপী ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়। ভূত্বক পরিবর্তনে এর ভূমিকা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।	এটি সীমিত অঞ্চলে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়। ভূ-ত্বকের পরিবর্তনে এর প্রভাব অনেক কম।
5. অনুভূতি-	এটি মানুষ বুঝতে পারে না বা ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।	এটি মানুষ টের পায় ও শক্তিশালী ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি হয়।



শীতল হওয়ায় উর্ধ্বমুখী শীতলবায়ু তার পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলীয় উয়তার তুলনায় শীতল হয়ে পড়ে কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘূর্ণবাতের মধ্যে তৈরি হওয়া গতিশক্তি অভিকর্ষজ বলের বিরুদ্ধে শীতলবায়ুকে ওপরে উঠতে সাহায্য করে। এভাবে শীতল বায়ুর উর্ধ্বপ্রবাহ ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ গতিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট না হয়। একসময় স্বেতিক শক্তি শেষ হলে এর গতিশক্তিতে রূপান্তর বন্ধ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে শীতলবায়ুকে ওপরে তুলতে সহায়তাকারী গতিশক্তির পরিমাণ শেষ হয়ে পড়ে। পরিণামে ঘূর্ণবাতের সমস্ত শক্তিই নিঃশেষ হয়ে যায়।

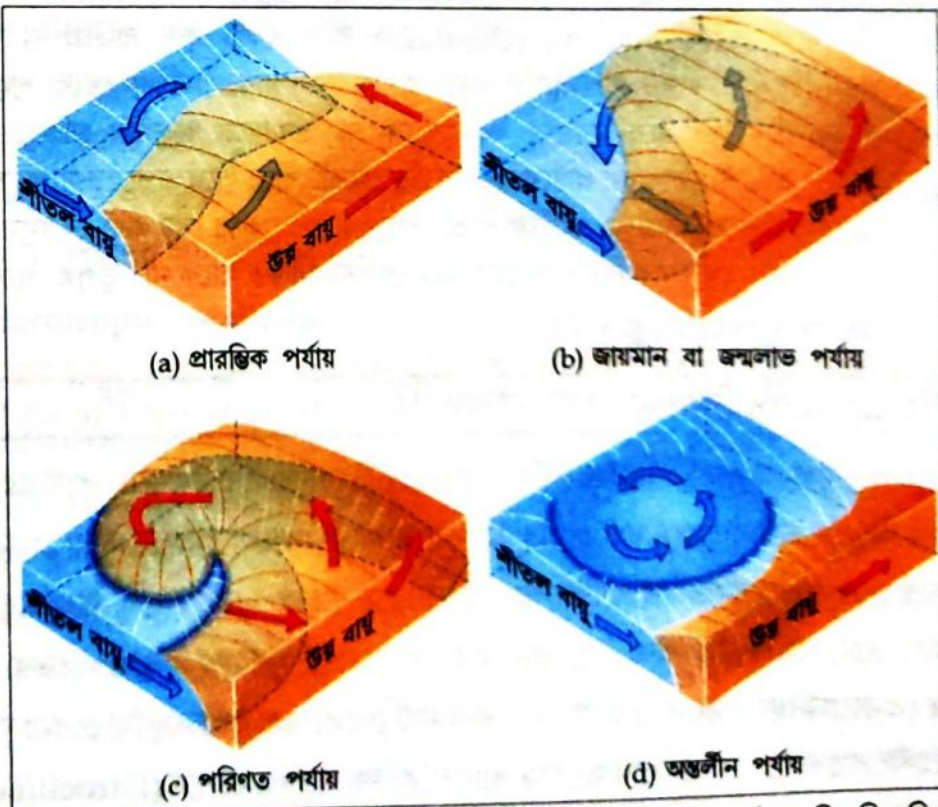
এভাবে মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চলে সীমান্ত সৃষ্টির প্রক্রিয়া (frontogenesis) দ্বারা উয়বায়ুকে সীমান্ত বরাবর উর্ধ্বমুখে চালিত করে বায়ুতে অবস্থিত স্বেতিক শক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তর দ্বারা নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাত সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে। আবার, অক্লসনের পর উর্ধ্ববায়ুমণ্ডলে উর্ধ্বমুখী উয়বায়ুর অ্যাডিয়াবেটিক শীতলীকরণের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা লাভ করে গতিশক্তি পুনরায় স্বেতিক শক্তিতে রূপান্তর এবং নিম্ন বায়ুমণ্ডলে সীমান্ত বরাবর শীতলবায়ুকে অভিকর্ষের বিপরীতে ওপরের দিকে চালিত করে গতিশক্তি ক্ষয়ের দ্বারা ঘূর্ণবাতটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

**প্রচলিত মেরুসীমান্ত তত্ত্ব (Conventional Polar front theory) :**

বার্কেনেস প্রদত্ত মেরু সীমান্ত তত্ত্বটি পরবর্তীকালে স্ট্রলার (1965), ব্যারি ও চোরলে প্রমুখেরা সামান্য পরিবর্তন করে, সাধারণীকরণ (generalization) করার চেষ্টা করেন। তাঁরা মূলত বার্কেনেস বর্ণিত ঘূর্ণবাত বিকাশের ৪টি পর্যায়কে ৪টি পর্যায়ের মধ্যে সংঘবদ্ধ করেন এবং প্রতিটি পর্যায়ের ত্রিমাত্রিক অবয়ব (model) দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই পর্যায়গুলি সম্বলিতভাবে **ঘূর্ণবাতের জীবনচক্র** নামে পরিচিত। এদের সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল—

**1. প্রারম্ভিক পর্যায় (Initial Stage) :** ঘূর্ণবাত সৃষ্টির প্রারম্ভে (চিত্র—19.7a) মেরু অঞ্চল থেকে আগত ভারী, শীতল

ও শুষ্ক মেরু বায়ুপুঞ্জ এবং ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে আগত হালকা, উয় ও আর্দ্র উপক্রান্তীয় বায়ুপুঞ্জ (পশ্চিমা বায়ু) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উপস্থিত হওয়ার পর এই দুই বায়ুপুঞ্জ পরস্পরের বিপরীতে প্রবাহিত হয়। মেরু বায়ুপুঞ্জ পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে এবং উপক্রান্তীয় বায়ুপুঞ্জ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এই দুই বায়ুপুঞ্জ খুব কাছাকাছি



চলে এলে এদের চিত্র : 19.7 একটি আদর্শ নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের ত্রিমাত্রিক চিত্র মাঝখানে একটি সীমান্ত বা বায়ুপ্রাচীরের সৃষ্টি হয় এবং ওই সীমান্ত বরাবর অত্যন্ত মৃদু আলোড়ন শুরু হয়। এই পর্যায়ে সীমান্ত প্রায় একই জায়গায় স্থির থাকে। এ সময়ে বাতাসের কোনোপ্রকার স্থানান্তর ঘটে না।

উৎস : Barry and Chorley (2009), Atmosphere, weather and climate

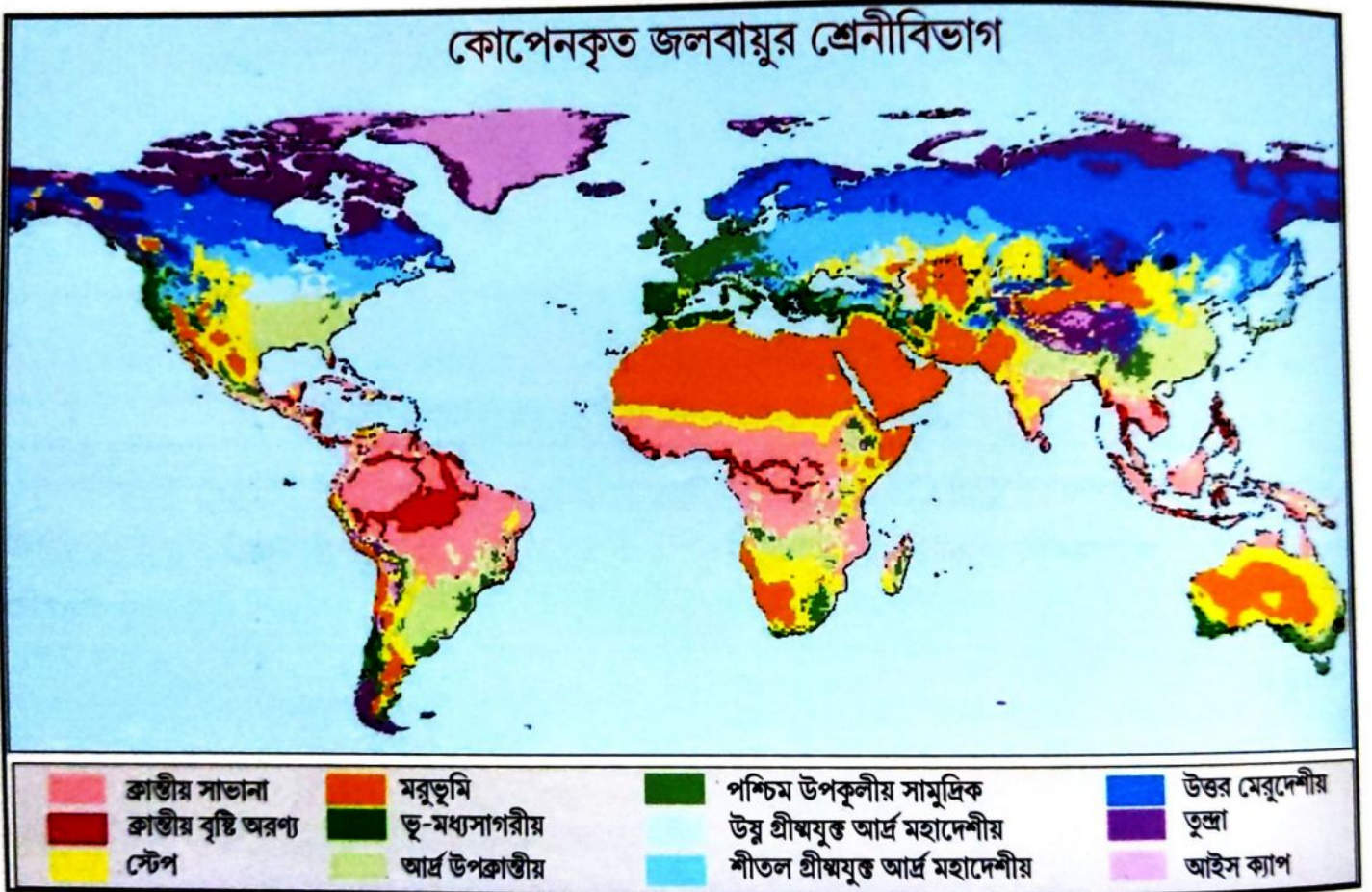


2. **জন্মান্ত বা জন্মলাভ পর্যায় (Incipient Stage)** : এই পর্যায়ে (চিত্র—19.7b) সীমান্তপৃষ্ঠে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। আঞ্চলিকভাবে পাহাড়-পর্বতের অবস্থানের জন্য কিংবা বায়ুর চাপঢালের পরিবর্তনের ফলে উত্তর গোলার্ধে শীতল বায়ুপুঞ্জ দিক পরিবর্তন করে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং গৌজের আকারে উষ্ণ বায়ুপুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করে। শীতল বাতাস উষ্ণ বায়ুপুঞ্জের ভিতর ঢুকে শীতল সীমান্ত সৃষ্টি করে। শীতল বায়ুপুঞ্জ এভাবে উষ্ণ বায়ুকে ধাক্কা দিলে উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ সংকুচিত হয় এবং দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুপুঞ্জকে সরিয়ে দিয়ে উষ্ণ সীমান্ত সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় উষ্ণ ও শীতল সীমান্তের মিলন-বিন্দুতে একটি **তরঙ্গশীর্ষ** (Wave crest) সৃষ্টি হয়। এভাবে ঘূর্ণবাত জন্মলাভ করে।
3. **পরিণত পর্যায় (Mature Stage)** : পরিণত পর্যায়ের প্রথম ভাগে (চিত্র—19.7c) সীমান্ত-বরাবর তীব্র আলোড়ন শুরু হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিস্তার ও বক্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এই সময়ে উষ্ণ ক্ষেত্র থেকে শীতল ক্ষেত্রে দিকে বাতাসের প্রবাহ শুরু হয়। ভারী শীতল বাতাস মাটি ঘেঁষে হালকা উষ্ণ বাতাসকে দ্রুত সরাতে থাকে, কিন্তু উষ্ণ বাতাস শীতল বাতাসকে ঠেলে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে না। ফলে, তখন উষ্ণ বাতাস শীতল বাতাসের সঙ্গে গঠিত একটি তির্যক তল, অর্থাৎ, উষ্ণ সীমান্ত বরাবর ওপরের দিকে দ্রুত উঠতে থাকে এবং ধীরে ধীরে শীতল বায়ুপুঞ্জকে সরাতে থাকে। এই সময় তরঙ্গের বিস্তার এবং বক্রতা (চিত্র—19.7d) সবচেয়ে বেশি হয় এবং ঘূর্ণবাত পরিণতি লাভ করে, অর্থাৎ, ঘূর্ণবাত পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। এই অবস্থায় ঘূর্ণবাত উষ্ণ ও শীতল—এই দুটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত থাকে। উষ্ণ বায়ু ওপরে উঠে ঘনীভূত হয় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। উষ্ণ সীমান্তের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধারাবাহিকভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই পর্যায়ের শেষ পর্বে উষ্ণ ক্ষেত্র দ্রুত সংকীর্ণ হতে শুরু করে, অর্থাৎ, আয়তনে ছোটো হয়ে আসে এবং অচিরেই শীতল সীমান্ত শীর্ষ বিন্দুর নিকটবর্তী উষ্ণ সীমান্তকে ধরে ফেলে বা উষ্ণ সীমান্তের নাগাল পেয়ে যায়। এ সময় থেকে **বন্ধ বাতাগ্র** বা **অন্তর্লীন পর্যায় (Occlusion Stage)** শুরু হয়।
4. **বন্ধ বাতাগ্র বা অন্তর্লীন পর্যায় (Occlusion Stage)** : এই পর্যায়ে শীতল সীমান্ত ধীর গতিসম্পন্ন উষ্ণ সীমান্তকে অবশেষে অতিক্রম (Overtake) করে একটি **বন্ধ বাতাগ্র** বা **অন্তর্লীন বাতাগ্র (Occluded front)** সৃষ্টি করে। অন্তর্লীন অবস্থা প্রথমে তরঙ্গের শীর্ষবিন্দু থেকে শুরু হয়, যেখানে উষ্ণ সীমান্ত ও শীতল সীমান্তের মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না। ক্রমাগতই অন্তর্লীন প্রক্রিয়া তরঙ্গশীর্ষ থেকে নীচের দিকে অগ্রসর হয়। শীতল বায়ুর প্রবাহে এভাবে উষ্ণ ক্ষেত্রটি ধীরে ধীরে ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ওপরে উঠে যায়। পরিশেষে, সমগ্র অঞ্চলটিকে শীতল বায়ুপুঞ্জ দখল করে নেয় এবং কেবলমাত্র শীতল বাতাসের একটি ঘূর্ণিই থেকে যায়। তখন অন্তর্লীন বাতাগ্রের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। ভূপৃষ্ঠ থেকে তাপশক্তির সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘূর্ণবাতের মৃত্যু ঘটে।

6. অবমেরু অঞ্চল	সারাবছর সীমিত অধঃক্ষেপণ।
7. সুমেরু, মহাদেশীয় উপবিভাগ	গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত, সীমিত শীতকালীন তুষারপাত।
8. উচ্চ সুমেরু অঞ্চল	সামান্য অধঃক্ষেপণ; গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত, শীতের শুরুতে তুষারপাত।

**Strahler এর শ্রেণিবিভাগ :** আরও একটি সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী পৃথিবীর জলবায়ুর উৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগ করেছেন Strahler। তিনি তিনটি প্রধান শ্রেণিবিন্যাস করেছেন।

- 1 নিম্ন অক্ষাংশীয় জলবায়ুসমূহ, নিরক্ষীয় এবং ক্রান্তীয় বায়ুপুঞ্জসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- 2 মধ্য অক্ষাংশীয় জলবায়ুসমূহ, ক্রান্তীয় এবং মেরুর বায়ুপুঞ্জসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- 3 উচ্চ অক্ষাংশীয় জলবায়ুসমূহ কুমেরু এবং সুমেরু বায়ুপুঞ্জসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।



## ● কোপেন-কৃত পৃথিবীর জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ ●

### (Köppen's Classification of World Climate)

কোপেন জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ করেছেন বার্ষিক ও মাসিক উত্তাপ এবং বৃষ্টিপাতের গড়ের উপর নির্ভর করে। কোন অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ সেই অঞ্চলের সামগ্রিক জলবায়ুর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রেই জলবায়ুর সীমানা চিহ্নিতকরণের সময় স্বাভাবিক উদ্ভিদের সীমানার কথা মনে রাখা হয়েছে। কোপেন মনে করেন উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির উপর বৃষ্টিপাতের কার্যকারিতা কেবল বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, এটি বাষ্পীভবনের পরিমাণ,

যা উদ্ভিদ ও মৃত্তিকার জল হ্রাস করে, তার উপর নির্ভরশীল; কারণ যে পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হয় তা উদ্ভিদের কোনো উপকারে আসে না। কোপেন-এর পদ্ধতি অনুযায়ী বাষ্পীভবনের মাত্রা (Evaporation Intensity) ও বৃষ্টিপাতের কার্যকারিতা (Precipitation Effectiveness) নির্দেশ করার উদ্দেশ্য হল বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের সংযোগসাধন। এটি বুঝিয়ে দেয় যে, সম পরিমাণ বৃষ্টিপাত অধিক বাষ্পীভবন যুক্ত উষ্ণ অঞ্চল অপেক্ষা কম বাষ্পীভবনযুক্ত অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চল উদ্ভিদের পক্ষে অধিক কার্যকর।

কোপেন পৃথিবীর জলবায়ুকে পাঁচটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যেগুলি পাঁচটি প্রধান উদ্ভিদশ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে। পাঁচটি জলবায়ু শ্রেণির প্রতিটি এক-একটি ইংরাজী ক্যাপিটাল লেটার দ্বারা সূচিত হয়। এইগুলি হল :

- A ক্রান্তীয় বৃষ্টি জলবায়ু, শীত ঋতু অনুপস্থিত;
- B শুষ্ক জলবায়ু;
- C মধ্য-অক্ষাংশীয় বৃষ্টি জলবায়ু, মৃদু শীত ঋতুসহ;
- D মধ্য-অক্ষাংশীয় অধিক শীতযুক্ত বৃষ্টি জলবায়ু;
- E গ্রীষ্মহীন মেরুদেশীয় জলবায়ু।

এদের প্রত্যেকটিকেই আবার ঋতু-বিশেষে বৃষ্টিপাতের বণ্টন অথবা শুষ্কতা বা শৈত্যের মাত্রার উপর নির্ভর করে ক্ষুদ্রতর বিভাগে ভাগ করা হয়। ইংরাজী স্মল লেটার f, s ও w বৃষ্টিপাতের ঋতুযোগ্যতা (Seasonability)-কে নির্দেশ করে। শুষ্ক ঋতুহীন অবস্থা (f), শুষ্ক গ্রীষ্ম (s), শুষ্ক শীত (w)। ক্যাপিটাল লেটার S ও W শুষ্ক ঋতুর দুটি উপ-বিভাগ স্টেপ বা প্রায় মরু (Steppe or Semi-arid) (S) এবং মরু (W) প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। ক্যাপিটাল লেটার T ও F অনুরূপভাবে তুন্ড্রা (T) ও আইস ক্যাপ (F) এই দুটি মেরুদেশীয় জলবায়ুকে নির্দেশ করে। নিম্নে প্রদত্ত সারণীতে কোপেন-কৃত পাঁচটি প্রধান জলবায়ুশ্রেণি এবং এগারো প্রকার জলবায়ু দেখানো হল। নিম্নোক্ত বর্ণ সংযোগের (Letter Combination) মধ্যে As ও Ds কদাচিৎ দৃষ্ট হয় এবং এই কারণে এদের প্রধান জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

### কোপেন-কৃত জলবায়ুর শ্রেণি ও প্রকারভেদ

জলবায়ুর শ্রেণি (Climatic Group)	চিহ্ন (Symbol)	শুষ্ক ঋতু (Dry Period)	শুষ্কতা বা শৈত্যের মাত্রা (Degree of Dryness or Coldness)
ক্রান্তীয় বৃষ্টি জলবায়ু (Tropical Rainy Climates)	A	f (s) w	.....
শুষ্ক জলবায়ু (Dry Climates)	B	.....	S W

উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ বৃষ্টি জলবায়ু (Warm Temperature Rainy Climates)	C	f (s) w	.....
শীতল তুষারময় আরণ্যক জলবায়ু (Cold Snowy Forest Climates)	D	f (s) w	.....
মেরুদেশীয় জলবায়ু (Polar Climates)	E	.....	TF

### A জলবায়ু

A : ক্রান্তীয় বৃষ্টি জলবায়ু (Tropical Rainy Climates); শীতলতম মাসের উত্তাপ  $68.8^{\circ}$  ( $10^{\circ}$  সেঃ)। কিছু কিছু ক্রান্তীয় উদ্ভিদ এই উত্তাপের নীচে জন্মাতে পারে না।

Af : ক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু (Tropical Wet Climate); f : শুক্কতম মাসের বৃষ্টিপাত অন্ততঃ ২.৪ ইঞ্চি (৬ সেমি)। এই জলবায়ুতে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের ঋতুগত পার্থক্য ন্যূনতম এবং উভয়ই সারা বৎসর অধিক থাকে।

Aw : ক্রান্তীয় আর্দ্র ও শুক্ক জলবায়ু (Tropical Wet Climate); w : শীতকাল শুক্ক। ঋতু অনুযায়ী বৃষ্টিপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে এবং অন্ততঃ একটি মাসে বৃষ্টি ২.৪ ইঞ্চির নীচে নামে। উত্তাপ Af- এর মতোই।

#### ● A জলবায়ুর সঙ্গে ব্যবহৃত অন্যান্য স্মল লেটারগুলি হল :

m (monsoon) : স্বল্পস্থায়ী শুক্ক ঋতু। কিন্তু বৃষ্টিপাত এত অধিক যে, সারা বৎসরই ভূমিভাগে বৃষ্টি অরশের অনুকূল আর্দ্রতা বজায় থাকে। Am জলবায়ু Af ও Aw-র মধ্যবর্তী অবস্থা। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ Af-এর ন্যায় এবং ঋতু অনুযায়ী বণ্টন Aw- এর মতো।

w' : বৃষ্টিপাত সর্বাধিক শরৎকালে।

w'' : বৎসরে দুবার বৃষ্টির আধিক্য ঘটে, যাদের মধ্যবর্তী পর্যায়ে থাকে দুটি শুক্ক ঋতু।

s : শুক্ক গ্রীষ্ম (বিরল)।

i : উষ্ণতম ও শীতলতম মাসের মধ্যে উত্তাপের পার্থক্য  $9^{\circ}$  ( $5^{\circ}$  সেঃ)- এর কম।

g : বার্ষিক উষ্ণতার পরিবর্তন গাণ্ডেয় অববাহিকার ন্যায়। বর্ষা ঋতুর পূর্বে উষ্ণতা সর্বাধিক হয়।

### B জলবায়ু

B : শুক্ক জলবায়ু (Dry Climates), যাতে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বৃষ্টিপাত অপেক্ষা অধিক। B জলবায়ুর দুটি উপ-বিভাগ রয়েছে—মরু-প্রকৃতির BW ও স্টেপ বা প্রায়-মরু (Semi-arid) BS।

BW : মরুভূমির জলবায়ু।

BS : প্রায়-মরু বা স্টেপ।

● B জলবায়ুর সঙ্গে ব্যবহৃত অন্যান্য স্মল লেটারগুলি হল :

h (heiss)	: বার্ষিক গড় উত্তাপ $৬৪.৪^{\circ}$ -এর উপর।
k (kalt)	: বার্ষিক উত্তাপের গড় $৬৪.৪^{\circ}$ -এর নিম্নে।
k'	: উষ্ণতম মাসের উত্তাপ $৬৪.৪^{\circ}$ -এর নিম্নে।
s	: গ্রীষ্মকালীন খরা (Summer Draught) : গ্রীষ্মকালের শুষ্ক মাসের তুলনায় অন্ততঃ তিনগুণ বেশি বৃষ্টি শীতের আর্দ্রতম মাসে।
w	: শীতকালীন খরা (Winter Draught) : শীতকালের শুষ্কতম মাসের তুলনায় অন্ততঃ দশগুণ বেশি বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালের আর্দ্রতম মাসে।
n (nebel)	: ঘন ঘন কুয়াশা। BWn এবং BSn প্রকৃতির জলবায়ু সাধারণতঃ দেখা যায় শীতল সমুদ্রস্রোত-সংলগ্ন উপকূল-বরাবর।

C জলবায়ু

C	: উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ বৃষ্টি জলবায়ু (Warm Temperature Rainy Climates); শীতলতম মাসের গড় উত্তাপ $৬৪.৪^{\circ}$ -এর কম, কিন্তু $২২.৬^{\circ}$ -এর ( $-৩^{\circ}$ সেঃ) অধিক। উষ্ণতম মাসের গড় উত্তাপ $৫০^{\circ}$ ( $১০^{\circ}$ সেঃ) এর উপর।
Cf	: কোনো সুস্পষ্ট শুষ্ক ঋতু নেই।
Cw	: শুষ্ক শীত; শীতের শুষ্কতম মাসের অন্ততঃ দশগুণ বেশি বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মের আর্দ্রতম মাসে।
Cs	: শুষ্ক গ্রীষ্ম; গ্রীষ্মের শুষ্কতম মাসের অন্ততঃ তিনগুণ বেশি বৃষ্টিপাত শীতের আর্দ্রতম মাসে।

● C জলবায়ুর সঙ্গে ব্যবহৃত অন্যান্য স্মল লেটারগুলি হল :

a	: উষ্ণ গ্রীষ্ম; উষ্ণতম মাসের গড় উত্তাপ $৭১.৬^{\circ}$ ( $২২^{\circ}$ সেঃ)-এর অধিক।
b	: শীতল গ্রীষ্ম; উষ্ণতম মাসের গড় উত্তাপ $৭১.৬^{\circ}$ ( $২২^{\circ}$ সেঃ)-এর নিম্নে।
c	: শীতযুক্ত স্থলস্থায়ী গ্রীষ্ম; চার মাসেরও কম সময় উত্তাপ $৫০^{\circ}$ ( $১০^{\circ}$ সেঃ)-এর উপর।
I	: A জলবায়ুর অনুরূপ।
g	: A জলবায়ুর অনুরূপ।
x	: সর্বাধিক বৃষ্টিপাত বসন্তের শেষে অথবা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ; গ্রীষ্মের শেষে শুষ্কতা বৃদ্ধি।
n	: B জলবায়ুর অনুরূপ।

D জলবায়ু

D	: শীতল তুষারময় আরণ্যক জলবায়ু (Cold Snowy Forest Climate) ; শীতলতম মাসের গড় উত্তাপ $২২.৬^{\circ}$ ( $-৩^{\circ}$ সেঃ)-এর নিম্নে। উষ্ণতম মাসের গড় উত্তাপ $৫০^{\circ}$ ( $১০^{\circ}$ সেঃ)-এর উর্ধ্বে।
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ১১.৯ ■ আবহাওয়া ও জলবায়ু

Df : আর্দ্র শীতযুক্ত শীতল জলবায়ু।

Dw : শুষ্ক শীতযুক্ত শীতল জলবায়ু; উত্তর-পূর্ব এশিয়ার প্রতীপ ঘূর্ণাবতপ্রবণ অঞ্চলে এটি দেখা যায়।

### ● D জলবায়ুর সঙ্গে ব্যবহৃত অন্যান্য স্মল লেটারগুলি হল :

d : শীতলতম মাসের গড় উত্তাপ  $-৩৬.৪^{\circ}$  ( $-৩৮^{\circ}$  সেঃ)-এর নিম্নে।

b : শীতল গ্রীষ্ম; উষ্ণতম মাসের গড় উত্তাপ  $৭১.৬^{\circ}$  ( $২২^{\circ}$  সেঃ)-এর নিম্নে।

f, s, w, a, b ও c অক্ষরগুলি C জলবায়ুর অনুরূপ।

## E জলবায়ু

E : মেরুদেশীয় জলবায়ু (Polar Climates); উষ্ণতম মাসের গড় উত্তাপ  $৫০^{\circ}$  ( $১০^{\circ}$  সেঃ)-এর নিম্নে। E জলবায়ুর দুটি উপ-বিভাগ চিহ্নিত করা যায়—ET, যেখানে খুব স্বল্প সময়ের জন্য উদ্ভিদের বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে এবং সামান্য উদ্ভিদের আবরণ চোখে পড়ে এবং EF, যেখানে চিরস্থায়ী তুষার ও একেবারেই উদ্ভিদশূন্য।

ET : তুন্ড্রা জলবায়ু (Tundra Climates); উষ্ণতম মাসের গড় উত্তাপ  $৫০^{\circ}$  ( $১০^{\circ}$  সেঃ)-এর নিম্নে, কিন্তু  $৩২^{\circ}$  ( $০^{\circ}$  সেঃ)-এর উর্ধ্বে।

EF : শূষ্ক (Perpetual Frost); সকল মাসের গড় উত্তাপই  $৩২^{\circ}$  ( $০^{\circ}$  সেঃ)-এর নিম্নে।

### ❖ সমালোচনা (Criticism) :

● **ত্রুটি (Demerits) :** কোপেন-কৃত জলবায়ুগত শ্রেণিবিভাগকে ভৌগোলিকগণ বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করেছেন। ① কেউ কেউ মনে করেন যে পৃথিবীর কোনো বিস্তৃত অংশের জন্য আবহাওয়া-বিষয়ক তথ্যের অভাবে জলবায়ুর সীমানা-সংক্রান্ত কঠোরতা এইরূপ বিভাগকে ত্রুটিপূর্ণ করেছে। ② তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, এর ফলে জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তথাকার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। ③ অন্যরা বলেন যে, কিছু কিছু জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলেও অন্যত্র কোপেন কোনো সুশৃঙ্খল নীতি মানেন নি। ④ এটাও বলা হয়েছে যে, কোপেন নিম্নভূমির জলবায়ুর বিভাগের জন্য যে সূত্র নির্দেশ করেছেন উচ্চভূমিতে তা প্রয়োগ করা সঠিক হয় নি। ⑤ জলবায়ু সৃষ্টির মূল কারণগুলি এই শ্রেণিবিভাগে উপেক্ষিত থেকেছে।

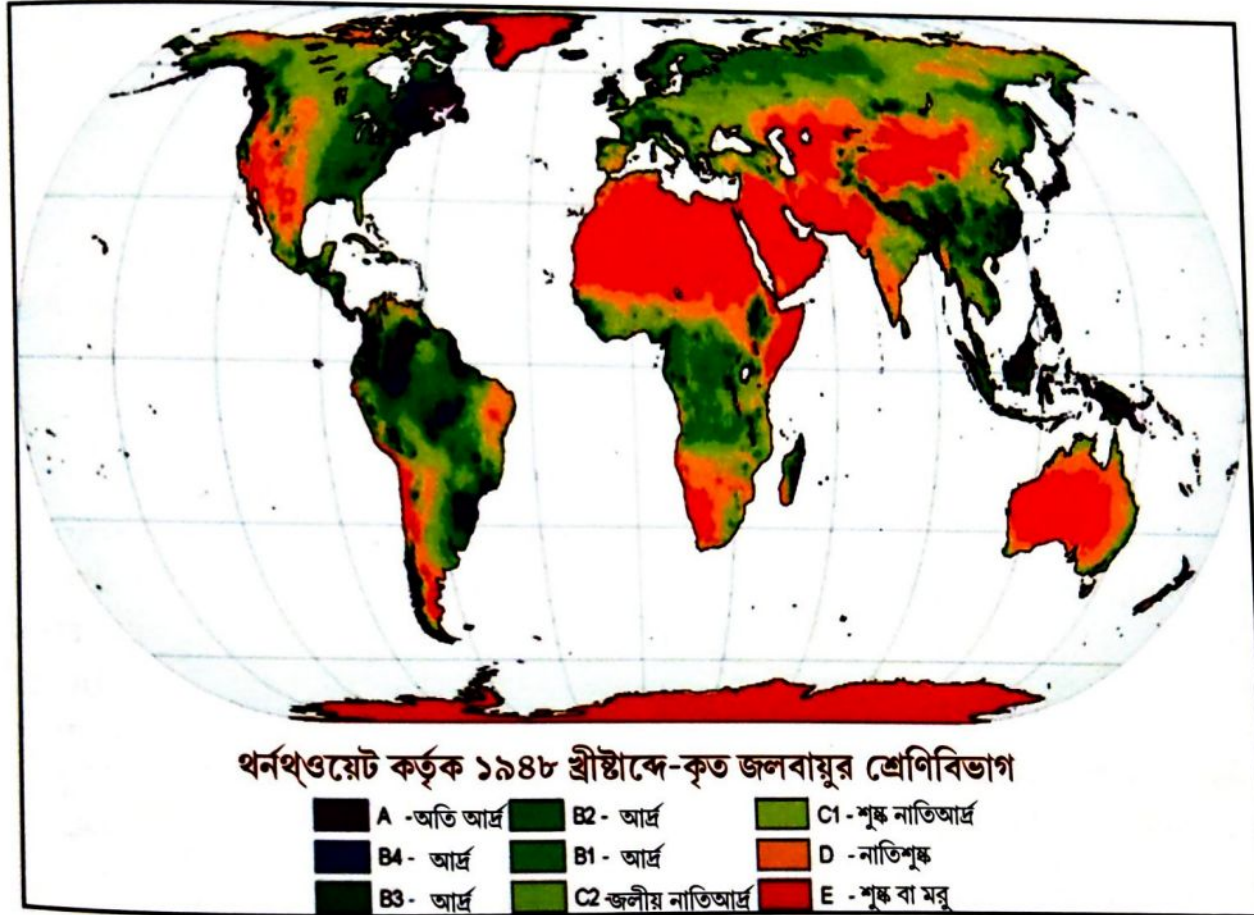
● **গুণাবলি (Merits) :** যা হোক, কোপেন-কৃত জলবায়ুগত একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হল, ① জলবায়ুর প্রকারভেদ নির্দেশে কতকগুলি আক্ষরিক চিহ্নের প্রয়োগ। এতে অহেতুক বর্ণনাতিশয়কে পরিহার করা গেছে। প্রত্যেক প্রকার জলবায়ুই কতকগুলি অক্ষরের সংযোগে বর্ণিত হয়েছে, যে অক্ষরগুলির প্রতিটিই অর্থবহ। ② পৃথিবীর জলবায়ুর সাধারণ বিন্যাস সুন্দরভাবে কোপেন-এর শ্রেণিবিভাগে দেখানো যায় এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় জলবায়ু বিভাগই যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়। ③ উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত যে পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করে শ্রেণিবিভাগটি করা হয়েছে তা পরিমাপ করা বা তথ্য পাওয়া সহজ ব্যাপার। ④ সংখ্যাতাত্ত্বিক দিকটি গুরুত্ব পাওয়ায় এই শ্রেণিবিভাজন খুবই সুনির্দিষ্ট। ⑤ নতুন ধরনের জলবায়ু এই শ্রেণিবিভাজনে সহজে যুক্ত হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং কোপেন-কৃত জলবায়ুগত শ্রেণিবিভাগ ত্রুটিমুক্ত নয় একথা স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় যে, জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ-সংক্রান্ত অধ্যয়নে এর গুণাবলীর তুলনায় ত্রুটিগুলি সামান্যই এবং যে কারণে এটি ভৌগোলিক ও আবহবিদগণের নিকট সর্বত্র ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে।

❖ থর্নথওয়েট-কৃত পৃথিবীর জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ ❖

(Thorntwaite's Classification of World Climate)

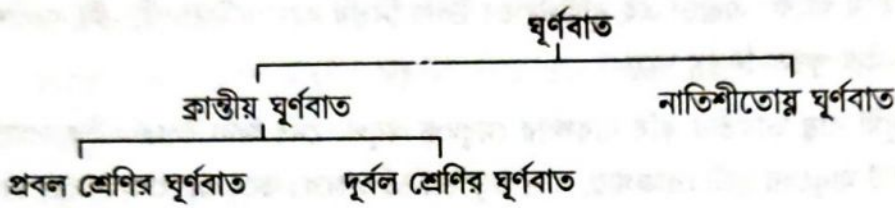
থর্নথওয়েট ১৯৩১-১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অন্য একটি জলবায়ুগত যে শ্রেণিবিভাগ করেন সেই দুটিকে পৃথক করা প্রয়োজন। থর্নথওয়েট-এর প্রথামোক্ত শ্রেণিবিভাগ সম্বলিত পৃথিবীর মানচিত্রটি আমরা পাই। কিন্তু ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃত শ্রেণিবিভাগের কোনো মানচিত্র পাওয়া সম্ভব হয় নি।



সাধারণতঃ ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে নিম্নচাপ এবং বাইরের চাপের মধ্যে পার্থক্য থাকে 10–20 mb। শীতকালে এর মাত্রা অনেক সময় বৃষ্টি পেয়ে 35 mb পর্যন্ত হয়। ঘূর্ণবাতের উচ্চতা 9.6 কিমি., ব্যাস 16,000 km পর্যন্ত হয়, ঘন্টায় এর গতিবেগ থাকে 48–108 কিমি। ঘূর্ণবাত উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (বামাবর্তে) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে (দক্ষিণাবর্তে) প্রবাহিত হয়। ব্যারোমিটারের পারদ ১৬ হঠাৎ নেমে গেলে ঘূর্ণবাতের আগমন বোঝা যায়। এর ফলে উষ্ণ অঞ্চলে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত এবং শীতল অঞ্চলে তুষারপাত ও বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

#### □ ঘূর্ণবাতের শ্রেণিবিভাগ [Classification of Cyclone] :

উৎপত্তির স্থান, প্রকৃতি এবং চরিত্র অনুযায়ী ঘূর্ণবাত প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা—



#### □ ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত [Tropical Cyclone] :

উভয় গোলার্ধের 6°–20° অক্ষাংশের মধ্যে উষ্ণতার প্রভাবের ফলে গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। একে ঘূর্ণবাতের চক্ষু [Eye of Cyclone] বলা হয়। ফলে চারদিক থেকে বায়ু প্রবল বেগে ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্র ভরাট করার জন্য কেন্দ্রের অভিমুখে কুণ্ডলাকারে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসে। কেন্দ্রে পৌঁছে ঐ বায়ু পর্যায়ক্রমে উষ্ণ ও উর্ধ্বগামী হয়। এই জাতীয় ঘূর্ণবাতকে উষ্ণমণ্ডলীয় বা ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত বলা হয়। World Meteorological Organization (W.M.O.) ক্রান্তীয় ঝঞ্ঝা (Tropical disturbance) কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—

[i] ক্রান্তীয় নিম্নচাপ [Tropical depression]

[ii] ক্রান্তীয় ঝড় ঝঞ্ঝা [Tropical storm] এবং

[iii] ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত [Tropical Cyclone]

● অবস্থান [Location] : ক্রান্তীয় অঞ্চলে জলভাগের উপর হঠাৎ নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হলে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়।

● বৈশিষ্ট্য [Characteristics] : ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—

⇒ ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রকে বলা হয় ঘূর্ণবাতের চক্ষু।

⇒ ক্রান্তীয় অঞ্চলে বায়ু শান্ত থাকে এবং ঘূর্ণবাতের ব্যাসার্ধ থাকে প্রায় 20–60 কিমি.।

⇒ এই ঘূর্ণবাত অত্যন্ত প্রবল ও বিধ্বংসী কিন্তু স্বল্পস্থায়ী।

⇒ জলভাগ থেকে এই ঘূর্ণবাত যখন স্থলভাগে প্রবেশ করে তখন তা দুর্বল হয়ে পড়ে।

⇒ এই ঘূর্ণবাত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন—

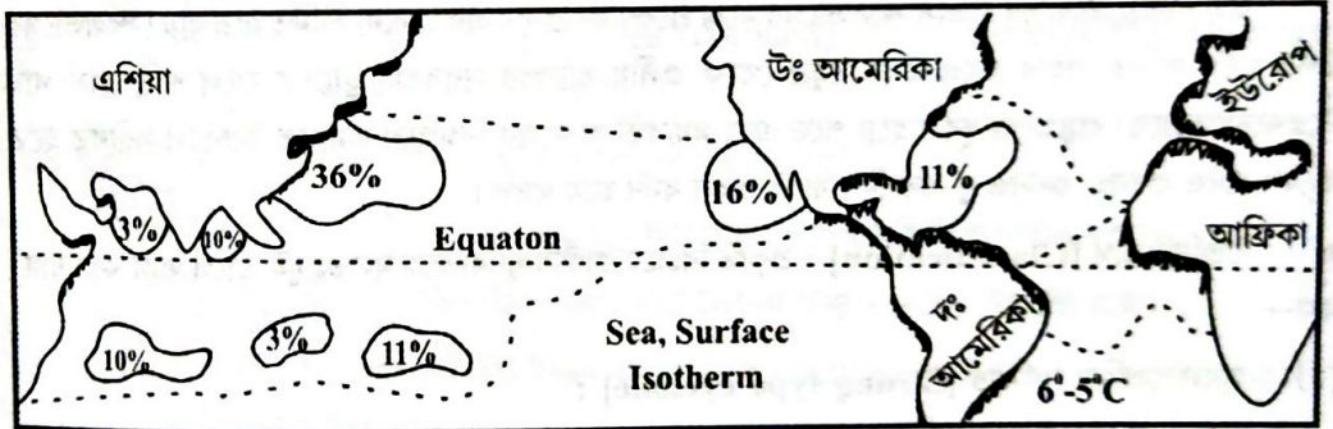
• টর্নেডো — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশে।

• টাইফুন — চীন ও জাপান উপকূল অঞ্চলে।

• কালবৈশাখী — ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে।



- উইলি উইলি — উত্তর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়।
- হ্যারিকেন — পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ক্যারিবিয়ান উপসাগরেও উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে।
- **ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টির অবস্থা [Formating Factors of Tropical Cyclone] :**  
নিম্নলিখিত অবস্থাগুলোর উপর ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত নির্ভর করে।
  - [i] সমুদ্র জলের উষ্ণতা  $26^{\circ}$ – $27^{\circ}\text{C}$  এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
  - [ii] সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে জলের গভীরতা 60–70 মিটার হওয়া দরকার।
  - [iii] অঞ্চলটি আন্তঃ ক্রান্তীয় সম্মিলিত অঞ্চল (I.T.C.Z) এর অধীনে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
  - [iv] ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere) এর উচ্চ অংশে ঝঞ্জা থাকা আবশ্যিক।
  - [v] Coriolis Parameters গুলো অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়।
  - [vi] উচ্চ ক্ষুণ্ণ মণ্ডলে [Troposphere] Divergence প্রক্রিয়া কাজ করা বাঞ্ছনীয়।
  - [vii] ক্ষুণ্ণমণ্ডলে 50–60% আর্দ্রতা কমপক্ষে থাকা বাঞ্ছনীয়।
  - [viii] সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে নিম্নচাপ থাকা অবশ্যস্বাভাবী।



চিত্র ৫.১৭ : ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের বন্টন

- **ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের গাঠনিক পর্যায় [Formation stages of Tropical Cyclone] :**  
চারটি প্রাকৃতিক পর্যায়ের মাধ্যমে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টি থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত পরিচালিত হয়। যথা—
  - (১) **গাঠনিক পর্যায় [Formation Phase] :**  
গাঠনিক পর্যায়ে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী সমুদ্রের উপর পরিবর্তনশীল বাতাস এলোমেলোভাবে প্রভাবিত হয়ে ব্যাপক বজ্রসহ বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলস্বরূপ ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে চাপ ক্রমশ হ্রাস পায়। বাতাস ক্রমাগত ঘূর্ণমান হয়ে অবশেষে একটি ঘূর্ণীঝড়ের রূপ পরিগ্রহণ করে। একে বায়ুমণ্ডলের অস্থিতিশীল অবস্থা [Unstable Condition] বলা হয়। এর থেকে ঘূর্ণীঝড়ের সৃষ্টি হয়।
  - (২) **বৃদ্ধির পর্যায় [Developing phase] :**  
এইরূপ পর্যায়ে বায়ুর চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে বায়ুপ্রবাহের বেগও বৃদ্ধি পায়। মধ্যবর্তী নিম্নচাপ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বাতাস ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরতে আরম্ভ করে। ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে আকাশ ঘন মেঘে আবৃত থাকে এবং পরবর্তী সময়ে প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। বাতাস ঘণ্টায় 24–40 কিমি. বেগে মধ্যবর্তী কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে যতক্ষণ পর্যন্ত বাতাস 60 কিমি./ঘণ্টা

বা তার কম বেগে প্রবাহিত হতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আবহাওয়া বিভাগ একে নিম্নচাপ বলে থাকে। এই নিম্নচাপের রেশ কখনও কখনও ৪৫ কিমি.— ১১৬ কিমি./ ঘণ্টা এর অধিক হয়ে থাকে।

### (৩) পরিণত পর্যায় [Mature Phase] :

পরিণত পর্যায়ে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত প্রবল আকার ধারণ করে। এই সময় ঘূর্ণীঝড়ের চারটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়।

- [i] ১০–২০km ব্যাসযুক্ত অঞ্চলের মধ্যবর্তী বাতাস মৃদু-মন্দভাবে প্রবাহিত হয় এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে।
- [ii] এর পরবর্তী পর্যায়ে ৫০–১৫০ কিমি. প্রস্থ অঞ্চলে বিক্ষুব্ধ বলয়ের সৃষ্টি হয়। যেখানে বায়ুর চাপ খাড়াভাবে নামে। এর ফলে বাতাস ঘণ্টায় ৯০ কিমি. বেগে প্রবাহিত হয় এবং প্রবল বৃষ্টিপাত সংঘটিত করে।
- [iii] বিক্ষুব্ধ এলাকার বাইরের দিকে বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, ফলে এই অঞ্চলটি নিম্নচাপ কেন্দ্রের চারিদিকে অপ্রতিসম অবস্থায় বিরাজ করে।
- [iv] সর্ব বাইরের বলয়টিতে দুর্বল ঘূর্ণীবায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে ঘূর্ণবাত্যা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হতে থাকে।

### (৪) অদৃশ্য অবস্থা [Disappear Phase] :

এই পর্যায়ে প্রবল ঘূর্ণ বাতাস স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করার পর এর প্রাধান্য সীমিত হয়ে যায়। স্থলভাগের উপর ঘর্ষণ জনিত বাধার ফলে এবং সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্পের সরবরাহ হ্রাসের ফলে শক্তি হ্রাস পায় উল্লেখযোগ্যভাবে। বায়ুপ্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মধ্যবর্তী অঞ্চলের নিম্নাংশে ক্রমাগত উচ্চচাপ পরিণত হতে থাকে। যদিও কখনও কখনও দু-এক দিন যাবৎ প্রবল বর্ষণ হয়ে থাকে।

● **শ্রেণিবিন্যাস [Classification] :** প্রকৃতি বিচারে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

### (১) সবল শ্রেণির ঘূর্ণবাত [Strong type cyclone] :

এই শ্রেণির ঘূর্ণবাত ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসনাশক। যেমন— টাইফুন, হ্যারিকেন, সাইক্লোন এবং পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ঘূর্ণীঝড়কে বলা হয় টর্নেডো [Tornado]। এইরূপ ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০০ কিমি. এর বেশি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর মোহনার সন্নিকটে মাঝে মাঝেই এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। আমাদের দেশেও কখনো কখনো টর্নেডোর আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটায় এবং ১৯৯৯ সালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে এর প্রভাবে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এ জাতীয় ঝড়ের প্রবলতম অংশে বায়ুর কোন রকম স্থানান্তর ঘটে না। এখানকার বায়ু প্রবল গতিতে কুণ্ডলাকারে [Spiral Wheel] ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্র থেকে উপরে উঠে যায়। হ্যারিকেন [Harricane] ও টাইফুন [Typhoon] ঝড়ের উৎপত্তির কারণ, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি একই রকমের। এদের কেন্দ্র বা চক্ষুর ব্যাস ২৫০–৬৫০ কিমি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। এখানকার বায়ুকুণ্ডলী আকারে পাক খেতে খেতে ওপরে ৯–১৪ কিমি. পর্যন্ত উঠে পড়ে। এতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তবে এদের স্থায়িত্ব বেশি নয়।

### (২) দুর্বল শ্রেণির ঘূর্ণবাত [Weak-type Cyclone] :

উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত কোন কোন স্থানে কখনো কখনো অধিক উষ্ণতার ফলে মৃদু ধরণের [Mild type] নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হলে এ জাতীয় ঘূর্ণবাতের উৎপত্তি হয়। এরা ডিপ্রেসন (দুর্বল শ্রেণির ঘূর্ণবাত) নামে পরিচিত। এই ডিপ্রেসানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একটানা কয়েকদিন বৃষ্টিপাত ঘটানো। এই প্রকার ঘূর্ণবাত প্রবল

ঝঞ্ঝাবাত্যার সৃষ্টি হয় না। শুধুমাত্র জোরে বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। এরা সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী। তাই এদের প্রভাবে মাঝে মাঝে বন্যা ও প্লাবনের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে প্রতি বছর বর্ষাকাল ও শরৎকালে কয়েকটি ডিপ্রেসনের আগমন ঘটে।

ঘূর্ণবাত হল এক প্রকার আকস্মিক বায়ু। এর প্রভাবে প্রতি বছর ভারতসহ সমগ্র বিশ্ব দাবুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একে রোধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আবহাওয়া দপ্তরের আগাম সতর্কতা কিছুটা হলেও এর প্রকোপ হতে মানুষসহ সমগ্র জীবকুলকে রক্ষা করতে সম্ভব হবে। আর সেটা যাতে পূর্ণাঙ্গভাবে সম্ভব হয় তার জন্য সকলকে সচেতন হতে হবে।

(খ) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ঘূর্ণবাত [Temperate Cyclone] :

মধ্য অক্ষাংশে বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উষ্ণ ও শীতল বায়ুপুঞ্জের মিলনস্থলে বা সীমান্তে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় তাতে হালকা জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু উর্ধ্বে উঠে বৃষ্টি ঘটায়। একে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ঘূর্ণবাত বলা হয়।

● নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি [Development of Temperate Cyclone] : দুটি ভিন্নধর্মী বায়ুপুঞ্জের সীমান্ত বরাবর এই ঘূর্ণবাত আত্মপ্রকাশ করে। এই বায়ুপুঞ্জ দুটির উষ্ণতা, ঘনত্ব এবং দিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। বায়ুপুঞ্জের এই সীমান্তমেরু-সীমান্ত বা অন্য কোন সীমান্ত হতে পারে। সুতরাং পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে এরূপ অনুভূমিক ভিন্ন উষ্ণতা যুক্ত বায়ুপুঞ্জ (Airmass) পরস্পরের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়, সেই সকল অঞ্চলেই এই ধরনের ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়।

নিম্নলিখিত কারণে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে ঘূর্ণবাতের উৎপত্তি ঘটে।

⇒ দুটি বিপরীতধর্মী বায়ুপুঞ্জ (Airmass) পরস্পরের বিপরীত দিকে অবস্থান করলে।

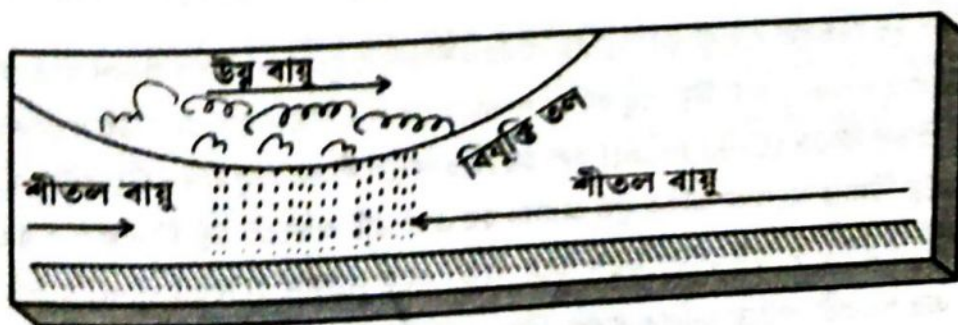
⇒ উষ্ণ ও শীতল সীমান্তের ঘর্ষণের ফলে আলোড়নের মাধ্যমে ঝড়ের উৎপত্তি হলে।

⇒ যখন উষ্ণ বায়ুপুঞ্জের কিয়দংশ শীতল বায়ুপুঞ্জের অভ্যন্তরে বক্রাকারে ঢুকে পড়ে। তখন ঘূর্ণবাতটি পরিণত অবস্থায় পৌঁছায়।

⇒ উষ্ণ বায়ুপুঞ্জের নীচে শীতল বায়ুপুঞ্জ এসে তাকে ঠেলে ওপরে তুললে।

⇒ অবশেষে উষ্ণবায়ুপুঞ্জ ও শীতল বায়ুপুঞ্জের উষ্ণতা প্রায় সমান হয়ে আসে। তখন ঘূর্ণবাত প্রশমিত হয়।

● ঘূর্ণবাত মডেল [Cyclone Model] : জে বিজারকেন্স [J. Bjerkness] বহুসংখ্যক নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাত অনুসন্ধান করে একটি ঘূর্ণবাত মডেল প্রস্তুত করেন। যা একটি ঘূর্ণবাতের আবশ্যিকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে। এই মডেলটিকে একটি আদর্শ ঘূর্ণবাতের মানচিত্র রূপে গণ্য করা যায়।



উচ্চকেন্দ্রে, তখনও  $V$  ঋণাত্মক হবে এবং উচ্চচাপ কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘূর্ণবাত বিরোধী গতি দেখা দেবে, চিত্র ২ (খ)। এক্ষেত্রে বাতাসের গতি পূর্ববর্তী উচ্চচাপ কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘূর্ণবাত বিরোধী গতির দ্রুতির চেয়ে অধিক। দ্বিতীয় মূল দ্বারা বর্ণিত গতিকে সাধারণ রীতি হিঁকৃত বলা যায়, কারণ এই ধরনের গতি সচরাচর দেখা যায় না। এখন অবশ্য দেখা যাচ্ছে যে যতটা অনুমান করা গেছে তার চেয়ে অধিক এই ধরনের গতি দেখা দিতে পারে। এই ধরনের গতি কম দেখা দেওয়ার কারণ হল এই ধরনের প্রবাহের জন্য বাতাসের প্রবল গতি প্রয়োজন।  
এখন অপেক্ষাকৃত বেশি সাধারণ ঘটনাগুলি গণনা করা যাক।

$$V = -\frac{fr}{2} + \sqrt{\frac{f^2 r^2}{4} + \frac{r}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r}}$$

স্পষ্টত যখন  $\frac{\partial p}{\partial r} > 0$ , অর্থাৎ নিম্নচাপ কেন্দ্রে যা বর্গমূল কখনই হতে পারে না এবং সেজন্য চাপ অবক্রমের সব মানই অনুমোদনীয়। নিম্নচাপ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকভাবে চাপ অবক্রমের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। কিন্তু উচ্চচাপ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে যেখানে

$\frac{\partial p}{\partial r} < 0$ , বর্গমূল হওয়া সম্ভব।  $V$ -এর জটিল মানের কোনো ভৌত ব্যাখ্যা নেই এবং বিবেচনাযোগ্য নয়।  $V$  বাস্তব হওয়ার শর্ত

$$\left| \frac{\partial p}{\partial r} \right| \leq \frac{\rho f^2 r}{4}$$

এর অর্থ উচ্চ কেন্দ্রবিশিষ্ট গতির ক্ষেত্রে চাপ অবক্রমের পরিমাণ নির্দিষ্ট মানের বেশি হতে পারে না এবং ঐ মান

অক্ষাংশ ও কেন্দ্রের দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। এথেকে স্পষ্ট যে  $r$  ক্ষুদ্র হওয়ার সাথে সাথে চাপ অবক্রমও অবশ্যই ক্ষুদ্র হবে এবং ইহাই উচ্চচাপ কেন্দ্রের নিকটে চাপ অবক্রম ক্ষুদ্র এবং বাতাস হালকা হওয়ার ব্যাখ্যা। নিম্নচাপ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই এবং চাপ অবক্রম ও বাতাস কেন্দ্রের নিকটে খুব বৃহৎ হতে পারে, যা প্রায়শই হয়।

এই উচ্চ কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতা উল্টে দেওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে চাপ অবক্রমের জন্য প্রবাহের বক্রতা ব্যাসার্ধ অসমতা (inequality) দ্বারা প্রদত্ত ন্যূনতম মানের নীচে নামবে না।

### 11.3.4 ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের গঠন (Structure of tropical cyclones) : ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের আঞ্চলিক গঠন 6 টি

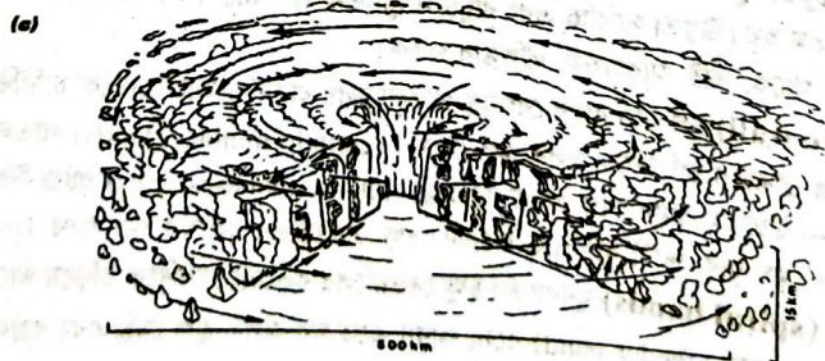
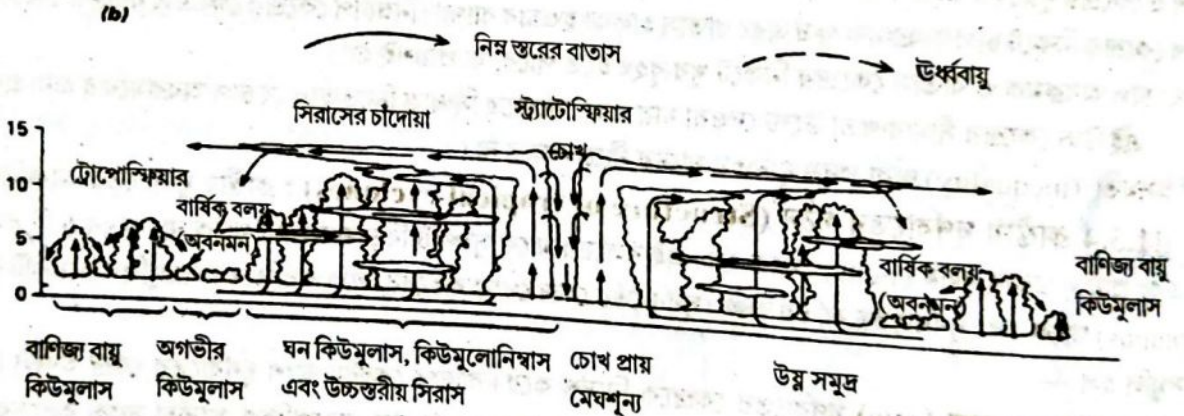
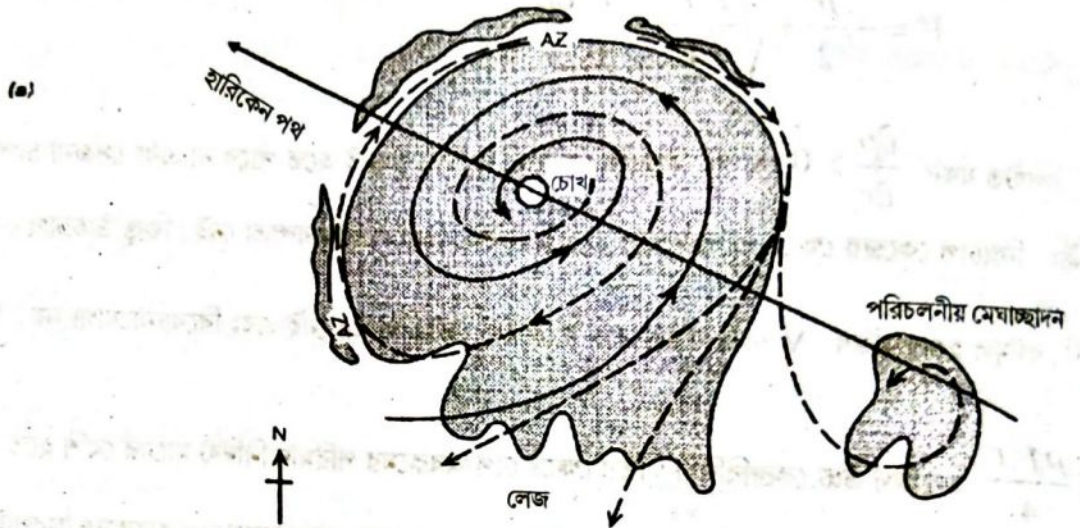
সম্যক এবং প্রায় বৃত্তাকার বলয় (belts) থেকে হয়। এই বলয়ের মাঝে সুস্পষ্ট বিভাজক সীমা থাকে না, কারণ 6 টি বলয় অবিচ্ছিন্ন (continuous) থাকে এবং ঘূর্ণবাতের অভিন্ন অঙ্গ। ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে থেকে বাইরের দিকে অবস্থিত বলয়গুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেগুলি হল —

- 1) **ঘূর্ণবাতের চক্ষু (eye)** ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রকে নির্দেশ করে। বাস্তবে কেন্দ্রীয় অংশ ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে অঞ্চল (core area) যাতে বায়ুর প্রবাহের বেগ ন্যূনতম হয়। উন্নতা সর্বোচ্চ এবং বায়ুচাপ ন্যূনতম হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সকল বলয়ের থেকে বেশি হয় কিন্তু আকাশ প্রায় মেঘমুক্ত থাকে, তাই আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে।
- 2) **চক্ষু দেওয়াল (eye wall)** হল উচ্চ বায়ুর বেগযুক্ত পাতলা বলয় যা ঘূর্ণবাতের 'চোখকে' চারিদিক থেকে ঘিরে থাকে। চক্ষু দেওয়াল বাস্তবে ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রের চারিদিকে জলদ-স্বূপ মেঘের (cumulo-nimbus clouds) পাতলা বলয়। এই বলয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন— উচ্চতম বায়ুর বেগ, প্রচণ্ড বজ্রঝঞ্ঝা (intense thunderstorms) প্রচণ্ড উন্নত (উর্ধ্বমুখী) বাতাস সঞ্চালন, বিস্ফোরক জলদ-স্বূপ মেঘ দ্বারা ভারী বৃষ্টিপাত ইত্যাদি। চক্ষু দেওয়ালের বলয়ের গড় প্রস্থ 10-20 কি.মি. হয়।
- 3) **সর্পিলাকার বলয় (spiral bands)** ঘূর্ণবাতের চক্ষু দেওয়ালের বলয়ের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। এই বলয়কে বৃষ্টি বলয় (rain bands) বা **পোষক বলয় (feeder band)** বলে, কারণ এতে ঘন জলদ-স্বূপ মেঘ এবং বজ্রঝঞ্ঝা থাকে যার থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। এই বলয়ে 50-80 কি.মি. দূরত্বে সর্পিলাকার বলয় থাকে।

সোসাইটির প্রকাশিত বই : 5. ভূগোলে পরিসংখ্যান পদ্ধতি (অমিতাভ মৈত্র), 6. দূর সংবেদ ও ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (অমিতাভ মৈত্র), 7. জনসংখ্যা ভূগোল (পারমিতা দত্ত), 8. প্রতিজ্ঞা (সাম্প্রদায়িকভাবে ভূগোল টেস্ট পেপার), 9. আধুনিক জলবায়ুবিজ্ঞান, 10. ভূগোল Hons মডেল উত্তর

4) অঙ্গুরীয়াকার বলয় (annular belt) সর্পিলাকার বলয়কে বাইরে থেকে ঘিরে থাকে। এই বলয়ের আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হয়, মেঘাচ্ছাদন ভালোভাবে থাকে না। বায়ু ওপর থেকে नीচে নেমে আসে, তাই বৃষ্টিপাত খুব কম হয়।

5) বাহ্যিক পরিচলন বলয় (outer convective belt) অঙ্গুরীয়াকার বলয়ের চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। এই বলয়ে বায়ুর অভিসরণের জন্য বায়ুমণ্ডলীয় অস্থিরতার কারণে পরিচলন ক্রিয়া তীব্র হয়। ফলে ঘন মেঘাচ্ছাদন থাকে, বৃষ্টিপাতও যথেষ্ট হয়। এই বলয়ের ওপর থেকে नीচে অবতলিত বায়ুপৃষ্ঠে বাহ্য প্রবাহ এবং বাইরের থেকে বায়ুর অভ্যন্তরীণ প্রবাহের জন্য দুই দিকযুক্ত বায়ুর অভিসরণ (convergence) হয়।



ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত (a) নকশা (b) পরিলেখ (c) ত্রিমাত্রিক চিত্র।

সোসাইটির প্রকাশিত বই : 1. সমকালীন ভূগোল (অমিতাভ মৈত্র), 2. সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভারতের আঞ্চলিক ভূগোল (পারমিতা দত্ত), 3. সংক্ষিপ্ত প্রমোক্তরে সাম্মানিক ভূগোল প্রথম খণ্ড (অমিতাভ মৈত্র), 4. সংক্ষিপ্ত প্রমোক্তরে সাম্মানিক ভূগোল দ্বিতীয় খণ্ড (অমিতাভ মৈত্র),

6) সীমান্ত বলয় (peripheral belt) বলতে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের সবথেকে বাইরের অংশকে বোঝায়। এই বলয়ে অল্প অল্প মেঘ থাকে, পরিচলন ক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে, তাই বৃষ্টিপাত খুব কম হয়।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের উল্লম্ব গঠনে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে তিনটি বলয় বা মণ্ডল (zones) থাকে। সেই তিনটি মণ্ডল হল—

a) অভ্যন্তরীণ প্রবাহ স্তর (inflow layer) হল সব থেকে নীচের মণ্ডল, যার উচ্চতা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে 3 কি.মি. উপর পর্যন্ত হয়। এই মণ্ডলের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল : বায়ুর সঞ্চালন কেন্দ্রের দিকে হয়, গরম সাগরীয় পৃষ্ঠ থেকে জলের বাষ্পীভবন হয়, জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন হয়, পরিচলন ক্রিয়ার বিকাশ হয়, মেঘ তৈরি হয়, ঘনীভবনের পর মুক্ত লীনতাপ ঘূর্ণবাতকে শক্তি প্রদান করে।

b) মধ্যবর্তী স্তর (middle layer) অভ্যন্তরীণ প্রবাহের ওপরের সীমা (পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে) 3 কি.মি. থেকে 6-7 কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এতে ঘূর্ণবাতের মুখ্য ঘূর্ণবাতীয় সঞ্চালন হয়, যা প্রায় বৃত্তাকার হয়।

c) উর্ধ্ব স্তর বা বাহ্যিক প্রবাহ স্তর (outer or outflow layer) মধ্যবর্তী স্তরের উর্ধ্বসীমা (6-7 কি.মি.) থেকে উপরে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই স্তরে বায়ুর অপসারী বায়ু সঞ্চালন (divergent air circulation) অর্থাৎ প্রতীপ ঘূর্ণবাতীয় সঞ্চালন হয়, ওপরের অংশে ক্ষোভমণ্ডলীয় পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়।

### 11.3.5 ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের সাথে সম্পর্কিত আবহাওয়া (Weather associated with tropical cyclones)

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের আগমনের আগে বায়ু দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু উষ্ণতা শীঘ্র বাড়তে থাকে। বায়ুচাপ হ্রাস পায়, বায়ুর বেগ বাড়তে থাকে। আকাশে অলক মেঘ দেখা যায়, সাগরে উঁচু ঢেউ ওঠে। ঘূর্ণবাত যখনই কাছে আসে বায়ু তুফানের রূপ ধারণ করে, আকাশ কালো জলদ-সুপ মেঘে ঢেকে যায়, ভীষণ মুশলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিক গড় হয় 10-25 সে.মি. কিন্তু এর পথ অবরুদ্ধ হওয়ার জন্য 75-100 সে.মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। আকাশ সম্পূর্ণভাবে মেঘে ঢাকা পড়ে যার জন্য দৃশ্যমানতা নষ্ট হয়। এই অবস্থা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। এরপরে হঠাৎই বায়ু শান্ত হয়, আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে পরিষ্কার হয়ে যায় ও বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। এই লক্ষণ ঘূর্ণবাতের চক্ষু বা কেন্দ্রের পরিচায়ক হয়। বায়ুচাপ কমে যায়। এই অবস্থা প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত বজায় থাকে। এর পরে ঘূর্ণবাতের পৃষ্ঠভাগ এসে যায়। মুশলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। এই অবস্থা দীর্ঘসময় পর্যন্ত বজায় থাকে। ঘূর্ণবাত যত এগোতে থাকে তত বায়ুচাপ বাড়তে থাকে। বায়ুর বেগ দুর্বল হয় এবং মেঘের আবরণ হালকা হওয়ার জন্য বৃষ্টিপাত ক্ষীণ বা দুর্বল হয়। ঘূর্ণবাত এগিয়ে যাওয়ায় আকাশে মেঘ সরে যায় এবং আবহাওয়া পরিষ্কার হয়।

### 11.3.6 ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের বন্টন (Distribution of tropical cyclones) : ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত মূল্যরূপে 5°-15° উত্তর অক্ষাংশের উপকূলবর্তী অংশকে প্রভাবিত করার পর শেষ হয়ে যায়। ক্রান্তীয়

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা গুলি বর্ণনা কর।

উঃ ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা সমূহ নিম্নরূপ -

ক) উষ্ণ জলভাগ ও বায়ুতে লীন তাপ সরবরাহঃ-

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হয় উষ্ণ সমুদ্রগুলিতে। সমুদ্র গুলির জলের উষ্ণতা অন্তত  $26^{\circ}$  -  $29^{\circ}$  সে. হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর ফলে জলের উপরিপৃষ্ঠ থেকে প্রচুর পরিমাণে বাষ্পীভবন ঘটেবে এবং এবং এই বাষ্প উর্দ্ধাকাশে গিয়ে ঘনীভবন ঘটাবে। ঘনীভবন কালে প্রচুর লীন তাপ বায়ুতে সংযোজন ঘটায়। এই প্রচুর লীনতাপ ঘূর্ণঝড়ের শক্তির প্রধান উৎস। অধিকাংশ ঘূর্ণঝড়গুলি ঘটে থাকে গ্রীষ্মের শেষ ভাগে ও শরতের প্রথম দিকে। কারণ এই সময় ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলভাগ সর্বাপেক্ষা উষ্ণ হয়।

খ) পূর্বতন নিম্নচাপজনিত অস্থিরতাঃ-

আগে থেকে পূর্বালী বায়ু তরঙ্গের প্রভাবে উপস্থিত নিম্নচাপ জনিত অবস্থা ঘূর্ণঝড় সৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে।

গ) কোরিওলিস বলঃ- নিরক্ষরেখায় কোরিওলিস বলের মান শূন্য হয়। নিরক্ষরেখা থেকে যতই ক্রান্তীয় মন্ডলের অক্ষরেখার দিকে আসা যায় ততই কোরিওলিস বলের মান বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় কোরিওলিস বল ঘূর্ণঝড়ের আবর্ত সৃষ্টি করার মতো যথেষ্ট শক্তি সম্পন্ন হয়। এই কারণে অধিকাংশ ক্রান্তীয় ঘূর্ণঝড় গুলি সংঘটিত হয়ে থাকে উত্তর গোলার্ধের  $10^{\circ}$  -  $20^{\circ}$  অক্ষাংশের মধ্যে।

ঘ) আর্দ্রতাঃ- ট্রপোস্ফিয়ারের মাঝামাঝি উচ্চতায় আর্দ্রতার মান অধিক থাকা প্রয়োজন। তবেই জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঢুকে কিউমুলোনিম্বাস মেঘ গঠন করবে, সমুদ্রের উপরেও এই মেঘ গঠন হবে না, যদি মধ্য ট্রপোস্ফিয়ারে আর্দ্রতার পরিমাণ  $50\%$  থেকে  $60\%$  এর কম হয়।

ঙ) উর্ধ্ব ট্রপোস্ফিয়ারে বায়ুর বিপরীত গমনঃ- উর্ধ্ব ট্রপোস্ফিয়ারে বায়ুর বিপরীত গমন ঘটবে সুসংহত ভাবে। উর্ধ্ব বায়ুর বিপরীত গমন নিম্ন বায়ুর অভিমুখী গমনের থেকে বেশি হবে। নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর অভিগমন ঘটবে এবং এই মিলিত বায়ু উর্ধ্বমুখে উল্লম্বভাবে উৎক্ষিপ্ত হবে। এটি ঘূর্ণঝড় সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সূচিত করে।

প্রশ্ন-

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের জীবন চক্র বা গাঠনিক পর্যায়গুলি আলোচনা কর।

উঃ- ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের আয়ু মোটামুটি ১০ দিনের মতো। এর জীবন চক্রকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় যথা -

ক) প্রারম্ভিক পর্যায় - গাঠনিক পর্যায়ে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী সমুদ্রের ওপর পরিবর্তনশীল বাতাস এলোমেলোভাবে প্রভাবিত হয়ে ব্যাপক বজ্রসহ বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলস্বরূপ ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বায়ুর চাপ ক্রমশ হ্রাস পায়। বাতাস ক্রমাগত ঘূর্ণমান হয়ে অবশেষে একটি ঘূর্ণঝড়ের রূপ পরিগ্রহণ করে। একে বায়ুমণ্ডলের অস্থিতিশীল অবস্থা বলা হয়। এর থেকে ঘূর্ণঝড়ের সৃষ্টি হয়।

খ) বিকাশশীল পর্যায় - এই পর্যায়ে বায়ুর চাপ ক্রমশ কমতে থাকে। বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়। ঝড়ের চক্ষুকে কেন্দ্র করে বাতাস আবর্তিত হতে থাকে ও ঘূর্ণবাত অগ্রসর হতে থাকে। বিশাল অঞ্চল জুড়ে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায় ও মুসলধারে বৃষ্টিপাত হয়। কোন কোন সময় একটি ঘূর্ণবাত ভেঙে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে একটি ঘূর্ণবাত ক্রমশ বড় হয়ে বিধ্বংসী শক্তিশালী ঘূর্ণবাতে পরিণত হয়।

গ) পরিণত পর্যায় - এই পর্যায়ে ঘূর্ণবাত প্রবল আকার ধারণ করে। এই সময় ঘূর্ণঝড়ের চারটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায় - ১)  $10-20$  কিমি ব্যাসযুক্ত কেন্দ্র অঞ্চল। এই অংশে মৃদুমন্দ বাতাস বয় ও আকাশ পরিষ্কার থাকে। ২) এর পরবর্তী অংশে আছে বিক্ষুব্ধ বলয় যার ব্যাস  $50-150$  কিমি। এই অংশে বায়ুর চাপীয় ঢাল খাড়া হয়, বাতাসের বেগ বেশি থাকে ও প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। ৩) বহিঃস্থ ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ বলয়ে বাতাস প্রবলতম বেগে প্রবাহিত হয় এবং ৪) সর্ববহিঃস্থ বলয়ে দুর্বল ঘূর্ণি বায়ু প্রবাহিত হয়।

ঘ) সমাপ্ত পর্যায় - এই পর্যায়ে প্রবল ঘূর্ণ বাতাস স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করার পর তার প্রাধান্য সীমিত হয়ে যায়। স্থলভাগের উপর ঘর্ষণজনিত বাধার ফলে এবং সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্পের সরবরাহের ফলে শক্তি হ্রাস পায় উল্লেখযোগ্য ভাবে। বায়ুপ্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মধ্যবর্তী অঞ্চলের নিম্নাংশে ক্রমাগত উচ্চ চাপ পরিণত হতে থাকে। যদিও কখনো কখনো দুই একদিন যাবত প্রবল বর্ষণ হয়ে থাকে।